মণিমেনাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

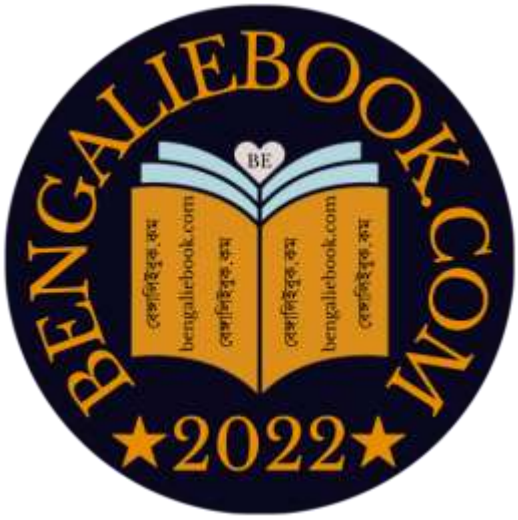

সূচিপত্র

০১. স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর 2
০২. তারপর সন্তোষবাবু আসিয়া 22
০৩. পরদিন রবিবার সকাল সাতটার সময় 46
০৪. সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম 67
০৫. শ্রীমতী সুকুমারীর বাসা 86
০৬. আমাদের কর্মচঞ্চলতা 102
০৭. সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় 114
০৮. সন্তোষবাবু মারা গেছেন 125

০১. স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর

স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে। সনাতন ভারতীয় আইন অনুসারে আমাদের স্বাধীনতা দেবী সাবালিকা হইয়াছেন, পলায়নী মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কঠিন সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় উপস্থিত। সুতরাং এ কাহিনী বলা যাইতে পারে।

নেংটি দত্ত নামধারী অকালপক্ক বালককে লইয়া কাহিনী আরম্ভ করিতেছি, কারণ সে না থাকিলে এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিত না। নেংটি একরকম জোর করিয়াই আমাদের বাসায় আসিয়া ব্যোমকেশের সহিত আলাপ জমাইয়াছিল। অত্যন্ত সংপ্রতিভ ছেলে, নাকে-মুখে কথা, বয়স সতেরো কি আঠারো, কিন্তু চেহারা রোগা-পাটকা বলিয়া আরো কম বয়স মনে হইত। এই বয়সে সে যথেষ্ট বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়াছিল, অথচ সেই সঙ্গে একটু ন্যাকা-বোকাও ছিল; একাধারে ছেলেমানুষ এবং এঁচড়ে-পাকা। অল্প পরিচয়ে অত্যন্ত ফাজিল ও ডেপো মনে হইলেও আসলে সে যে মন্দ ছিল না। তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। ব্যোমকেশকে সে মনে মনে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মনে হইত। ব্যোমকেশের সমস্ত চালাকি সে ধরিয়া ফেলিয়াছে, ব্যোমকেশের চেয়ে তাহার বুদ্ধি অনেক বেশি।

যখনই সে আমাদের বাসায় আসিত, ব্যোমকেশের সঙ্গে অপরাধ-বিজ্ঞান লইয়া পরম বিজ্ঞের মত আলোচনা করিত। ছেলেটা লেখাপড়ায় বহুদিন ইস্তফা দিয়াছে কিন্তু একেবারে অজ্ঞ নয়, ব্যোমকেশ হাসি মুখে তাহাকে আস্কারা দিত। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে প্রীতি-কৌতুক মিশ্রিত একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দুচার দিন আনাগোনা করার পর নেংটি হঠাৎ একদিন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটা সিগারেট দিন না।'

ব্যোমকেশ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল, তারপর ধমক দিয়া বলিল, 'এতটুকু ছেলে, তুমি সিগারেট খাও।'

নেংটি বলিল, 'পাব কোথায় যে খাব? মাসিমা একটি পয়সা উপুড়-হস্ত করে না, মাঝে-মধ্যে মেসোমশাইয়ের টিন থেকে দুএকটা চুরি করে খাই। তাছাড়া বাড়িতে কি সিগারেট খাওয়ার জো আছে? ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই মাসিমা মারমার করে তেড়ে আসে। দিন না একটা।'

ব্যোমকেশ তাহাকে একটা সিগারেট দিল, সে তাহা পরম যত্নে সেবন করিয়া শীঘ্র আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর সে যখনই আসিত তাহাকে একটা সিগারেট দিতে হইত।

একদিন নেংটি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আসিয়া বলিল, 'জানেন ব্যোমকেশদা, আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে এসেছে, ঠিক বিলিতি মেমের মত দেখতে।'

ব্যোমকেশ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, 'তাই নাকি।'

নেংটি বলিল, 'হ্যাঁ, এত সুন্দর মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। আপনি যদি দেখেন ট্যারা হয়ে যাবেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে দেখব না। কে তিনি?'

নেংটি বলিল, 'মেসোমশাইয়ের বন্ধুর মেয়ে। পূর্ববঙ্গে থাকত, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বাপ-মা মরে গেছে; মেয়েটা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। মেসোমশাই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। আমারই মত অবস্থা।'

মনে মনে নেংটির মেসোমশাই সন্তোষ সমাদ্দারকে সাধুবাদ করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও নেংটির মারফৎ তাঁহার কথা জানিতাম। তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তি, তাঁহার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কীর্তিকলাপ বাংলাদেশে কাহারও অবিদিত নয়। আমরা তাঁহার পারিবারিক পরিস্থিতির কথাও জানিতাম। বস্তুত, যে কাহিনী লিখিতেছি তাহা সন্তোষবাবুরই পারিবারিক ঘটনা।

ঘটনার পূর্বকালে ও উত্তরকালে এই পরিবারের মানুষগুলি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা স্থূলভাবে এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আকস্মিক মৃত্যু আসিয়া এই সমৃদ্ধ পরিবারের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটাইয়াছিল। আবার আকস্মিক মৃত্যুই নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। অনেক দিন নেংটিকে দেখি নাই–। কিন্তু যাক।

সন্তোষ সমাদ্দার ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। চৌরঙ্গী হইতে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর যাইলে একটি উপ-রাস্তার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড দ্বিতল বাগান-ঘেরা বাড়ি। সন্তোষবাবু কিন্তু বাড়িতে কমই থাকিতেন; সারা দিন ব্যবসা-ঘটিত কাজে-কর্মে এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাও শনিবার সন্ধ্যার পর তাঁহাকে বাড়ি পাওয়া যাইত না, অফিসের কাজ-কর্ম সারিয়া তিনি এক কীর্তন-গায়িকার গৃহে গান শুনিতে যাইতেন; তারপর একেবারে সোমবার সকালে সেখান হইতে অফিসে যাইতেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল আন্দাজ আটচল্লিশ বছর।

তাঁর স্ত্রী চামেলি সমাদ্দার বয়সে তাঁর চেয়ে দুতিন বছরের ছোট। শীর্ণ লম্বা স্নায়ুবিক প্রকৃতির স্ত্রীলোক, যৌবনকালে সন্ত্রাসবাদীদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সন্তোষবাবুর সহিত বিবাহের পর কয়েক বছর শান্তভাবে সংসারধর্ম পালন করিয়া ছিলেন, দু'টি যমজ পুত্রসন্তানও জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার চরিত্রে শুচিবাই দেখা দিল, স্বভাব তীক্ষ্ণ ও ছিদ্রান্বেষী হইয়া উঠিল। বাড়িতে মাছ-মাংস রহিত হইল, স্বামীর সহিত এক বাড়িতে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন সম্পর্ক রহিল না। এইভাবে গত দশ-বারো বছর কাটিয়াছে।

ইঁহাদের দুই যমজ পুত্র যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। বয়স কুড়ি বছর, দু'জনেই কলেজে পড়ে। যমজ হইলেও দুই ভাইয়ের চেহারা ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত; যুগলচাঁদের ছিপছিপে চেহারা, তরতরে মুখ; উদয়চাঁদ একটু গ্যাঁটা-গোটা ষণ্ডা-গুণ্ডা ধরনের। যুগলচাঁদ ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে; লেখাপড়ায় ভাল, লুকাইয়া কবিতা লেখে। উদয় দাম্ভিক ও দুদন্তি,

সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোটেলে গিয়া মুর্গী খায়। শ্রীমতী চামেলি তাহাকে শাসন করিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে বোধহয় দুই ছেলের মধ্যে তাঁহাকেই একটু বেশি ভালবাসেন।

এই চারজন ছাড়া আরো তিনটি মানুষ বাড়িতে থাকে। প্রথমত, নেংটি ও তাহার ছোট বোন চিংড়ি। বছর দুই আগে তাঁহাদের মাতা পিতা একসঙ্গে কলেরা রোগে মারা গিয়াছিলেন, নেংটি ও চিংড়ি অনাথ হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমতী চামেলি তাঁহাদের সাক্ষাৎ মাসি নন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই অবধি তাহারা এখানেই আছে। নেংটির পরিচয় আগেই দিয়াছি, চিংড়ি তাহার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। তাহার চেহারাটি ছোটখাটো, মোটের উপর সুশ্রী; এই বয়সেই সে ভারি বুদ্ধিমতী ও গৃহকর্ম্মনিপুণা হইয়া উঠিয়াছে। মাসিমা শুচিবাই-এর জন্য অধিকাংশ সময় কল-ঘরে থাকেন, চিংড়িই সংসার চালায়। যুগলচাঁদ তাহার নাম দিয়াছে কুচোচিংড়ি।

তৃতীয় যে ব্যক্তিটি বাড়িতে থাকেন তাঁহার নাম রবিবর্মা। পুরা নাম বোধকরি রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মণ; কিন্তু তিনি রবিবর্মা নামেই সমধিক পরিচিত। দীর্ঘ কঙ্কালসার আকৃতি; মুখের ডৌল, চোখের বক্রতা এবং গোঁফ-দাড়ির অপ্রতুলতা দেখিয়া ত্রিপুরা অঞ্চলের সাবেক অধিবাসী বলিয়া সন্দেহ হয়; বয়স আন্দাজ চল্লিশ। ইনি সন্তোষবাবুর একজন কর্ম্মচারী, তাঁহার রাজনীতি-ঘটিত ক্রিয়াকলাপের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি। নিজের সংসার না থাকায় তিনি সন্তোষবাবুর গৃহেই থাকেন, বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছেন; প্রয়োজন হইলে বাড়ির কাজকর্ম্মও দেখাশোনা করেন।

এই সাতটি মানুষের সংসারে হঠাৎ যেদিন একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাব ঘটিল, সেদিন মৃত্যু-দেবতার মুখে যে কুটিল হাসি ফুটিয়াছিল তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। নেংটি প্রথম দিনই আসিয়া যুবতীর আবিভাবের খবর দিয়াছিল; তারপর যতবারই আসিয়াছে মশগুল হইয়া যুবতীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছে, পরিবারের মধ্যে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রবল আবহ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছে। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে নেংটিদের সংসারে একটি দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা যে এমন মারাত্মক আকার ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করি নাই।

যুবতীর আবিভবের মাস ছয়েক পরের কথা। দুর্গাপূজা শেষ হইয়া কালীপূজার তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ আমাদের বসিবার ঘরে আলো জ্বালিয়া একমনে রামায়ণ পড়িতেছিল। রাজশেখর বসু মহাশয় মূল বাল্মীকি রামায়ণের চুল ছটিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া তারতরে ঝরঝরে করিয়া দিয়াছেন, ব্যোমকেশ কর্মহীন দিবসের আলুনি প্রহরগুলি তাহারই সাহায্যে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তক্তপোশে চিৎ হইয়া অলসভাবে এলোমেলো চিন্তা করিতেছিলাম। সাম্প্রতিক শারদীয়া পত্রিকায় যে কয়টি রচনা পড়িয়াছি, তাহা হইতে মনে হয় বাঙালী লেখক বাংলা ভাষা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা যেমন স্বাধীনতা পাইয়াছি, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি-শাসনহীন অবাধ স্বৈরাচার.মানুষের মন আজ উন্মার্গগামী, জলে-স্থলে-আকাশে সর্বত্র সে ধৃষ্টতা করিয়া বেড়াইতেছে...আজ সকালে সংবাদপত্রে দেখিলাম একটা এরোপ্লেন চাটগাঁ হইতে কলকাতা আসিতেছিল, বানচাল হইয়া সমুদ্রে ডুবিয়াছে. পাকিস্তান এয়ার লাইনসের প্লেন—একটি লোকও বাঁচে নাই, মৃতদেহের দীর্ঘ ফিরিস্তি বাহির হইয়াছে...আমরা আকাশচারী হইয়া উঠিয়াছি, মাটিতে

আর পা পড়ে না...কবি সত্যেন দত্ত এরোপ্লেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'উদ্‌গত-পাখা জাঁদরেল পিপীলিকা'–উপমাটা ভারি চমকপ্রদ।

'পার্বতীর দাদার নাম জানো?'

তক্তপোশে উঠিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ রামায়ণ রাখিয়া সিগারেট ধরাইতেছে। বলিলাম, 'পার্বতীর দাদা! কোন পার্বতী?

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'মহাদেবের পার্বতী, হিমালয়-কন্যা পার্বতী।'

'ও, বুঝেছি। পার্বতীর দাদা ছিল নাকি?'

'ছিল।' ব্যোমকেশ তর্জনি তুলিয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তার নাম মৈনাক পর্বত। সেকালে পাহাড়দের পাখনা ছিল, উড়ে উড়ে বেড়াতো, যখন ইচ্ছে নগর-জনপদ প্রভৃতি লোকালয়ের ওপর গিয়ে বসতো। নগর-জনপদের কী অবস্থা হত বুঝতেই পারছি। দেখে-শুনে দেবরাজ ইন্দ্র চটে গেলেন, বজ্র নিয়ে বেরুলেন। পৃথিবীর যেখানে যত পাহাড় পর্বত আছে, বজ্র দিয়ে সকলের পাখনা পুড়িয়ে দিলেন। কেবল হিমালয়-পুত্র মৈনাক পালানো, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে রইল। সেই থেকে মৈনাক সমুদ্রের তলায় আছে, মাঝে মাঝে নাক বার করে, আবার ডুব মারে। অনেকটা ফেরারী আসামীর মত অবস্থা।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র এত বড় দেবতা, তিনি মৈনাককে ধরতে পারলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্দ্র দেবরাজ ছিলেন বটে, কিন্তু সত্যান্বেষী ছিলেন না। তাছাড়া, তিনি প্রচণ্ড মাতাল এবং লম্পট ছিলেন।'

প্রচণ্ড মাতাল এবং লম্পট হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র দেবতাদের রাজা হইলেন কি করিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের ঘরে কিড়িং কিড়িং। শব্দে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। অনেকদিন এমন মধুর আওয়াজ শুনি নাই; মনটা নিমেষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিশ্চয় কেহ বিপদে পড়িয়া ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হইয়াছে। ব্যোমকেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার আগেই আমি তড়াক করিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। বিপন্ন শরণার্থীকে দাঁড় করাইয়া রাখা ঠিক নয়।

ফোনে নেংটির গলা শুনিয়া একটু দমিয়া গিয়াছিলাম, তারপর তাহার বাতা শুনিয়া আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। নেংটি বলিল, 'অজিতবাবু, শীগগির ব্যোমকেশদাকে নিয়ে আসুন। হেনা মল্লিক মরে গেছে।'

হেন মল্লিক, অর্থাৎ সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'মরে গেছে। কী হয়েছিল?'

নেংটি বলিল, 'তেতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মরে গেছে। পুলিস এসেছে। মেসোমশাই বাড়ি নেই-আজ শনিবার—আপনারা শীগগির আসুন।'

ব্যোমকেশ আসিয়া আমার হাত হইতে টেলিফোন লইল, বলিল, 'কে, নেংটি! কী হয়েছে?'

সে কিছুক্ষণ ধরিয়া শুনিল, তারপর–'আচ্ছা-দেখি'–বলিয়া টেলিফোন রাখিয়া দিল। আমরা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘড়িতে তখন সাতটা বাজিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিট হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, যাবে কি না ভাবছ?'

সে বলিল, 'যাওয়া উচিত কি না ভাবছি। গৃহস্বামী ডাকেননি, হয়তো ব্যাপারটা অপঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়; এ অবস্থায় নেংটির ডাক শুনে যাওয়া উচিত হবে কি?'

আমি বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'গৃহস্বামী বাড়ি নেই। আর যারা আছে তারা ছেলেমানুষ। বাড়িতে পুলিস এসেছে। নেংটিকে হয়তো তার মাসিম আমাদের কাছে খবর পাঠাতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আমরা যদি যাই, খুব অন্যায় হবে কি?'

ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা বটে। চল তবে বেরুনো যাক।'

সন্তোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম সাড়ে আটটা নাগাদ। ফটকের দেউড়িতে কেহ নাই। বাড়িটা অন্ধকারে দেখা গেল না, কেবল বাড়ির বহিভাগে দেওয়ালের গায়ে ভারা বাঁধা হইয়াছে চোখে পড়িল। বোধহয় দেওয়ালির আগে মেরামত ও চুনকামের কাজ চলিতেছে।

বাড়িতে প্রবেশ করিলেই বড় একটি সাজানো হল-ঘর, মাথার উপর চার-পাঁচটা তীব্র বৈদ্যুতিক বালব ঘরটিকে দিনের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ঘরের মাঝামাঝি স্থানে একটু নীচু গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটা চেয়ার এবং সোফা। আমরা ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে আট-দশ জন পুরুষ রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইউনিফর্ম-পরা পুলিস।

আমরা প্রবেশ করিলাম কেহ লক্ষ্য করিল না। একজন ইন্সপেক্টর টেবিলের সামনে বসিয়া নত হইয়া ডায়েরিতে কিছু লিখিতেছিলেন, বাকি সকলে টেবিল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সকলের

তাহাদের মধ্যে নেংটিকে চিনিতে পারিলাম। বাকি তিনজনের মধ্যে একজন যে সেক্রেটারি রবিবর্মা তাহা তাহার মঙ্গোলীয় মুখ দেখিয়া সহজেই বোঝা যায়। অবশিষ্ট দুইজন অল্পবয়স্ক যুবক, সুতরাং নিশ্চয় যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। দু'জনের মুখেই শক-খাওয়া জবুথবু ভাব, এখনো প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই।

আমরা প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল। বাঁ দিকে আসবাব কিছু নাই, কেবল দূরের কোণে উচু টিপয়ের উপর টেলিফোন, মাঝখানে গোল টেবিল ঘিরিয়া কয়েকজন লোক, ডান দিকে প্রায় দেওয়ালের কাছে সাদা কাপড়-ঢাকা একটি মূর্তি মেঝোয় পড়িয়া আছে; তাহার ওপারে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে দুইটি স্ত্রীলোক ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিয়া আছে; নিশ্চয় শ্রীমতী চামেলি ও চিংড়ি। তাঁহাদের চোখে অবিমিশ্র বিভীষিকা; তাঁহারা চাদর-ঢাকা মৃতদেহের পানে চাহিতেছেন না, একদৃষ্টি ঘরের মাঝখানে সমবেত মানুষগুলির পানে চাহিয়া আছেন।

ব্যোমকেশও এক নজরে সব দেখিয়া লইয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইল, টেবিলের সম্মুখস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আরো! এ কে রে!'

ইন্সপেক্টর ডায়েরি হইতে মুখ তুলিলেন; অন্য সকলে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। ইন্সপেক্টর ডায়েরি বন্ধ করিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ! তুমি কোত্থেকে?'

ব্যোমকেশ তাঁহার হাতে হাত মিলাইল, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিল না; আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। জানিতে পারিলাম, ইহার নাম অতুলকৃষ্ণ রায়, সংক্ষেপে এ কে রে। কলেজে ব্যোমকেশের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এখন কলিকাতায় আছেন। আমার সহিত ইতিপূর্বে দেখা না হইলেও ব্যোমকেশের সহিত কলে-ভদ্রে দেখাশোনা হয়। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, খুব আমুদে লোক, কিন্তু কাজের সময় গম্ভীর ও মিতভাষী।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্যাপার কি? শুনলাম একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছে!'

'হ্যাঁ।' কিছুক্ষণ নত-চক্ষে চিন্তা করিয়া এ কে রে বলিলেন, 'এস, তোমাকে বলছি।'

আমরা দল হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম, এ কে রে অল্প কথায় ঘটনা বিবৃত করিলেন।–তিনি এখন এই এলাকার থানার দারোগা। আজ সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে দশ মিনিটে তিনি টেলিফোনে খবর পান যে, সন্তোষবাবুর বাড়িতে একটি অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে; ফোন করিয়াছিলেন। সেক্রেটারি রবিবর্মার্ণ। এ কে রে তৎক্ষণাৎ লোকজন লইয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ির পশ্চিমদিকে, যেদিকে ভারা বাঁধা হয় নাই, সেইদিকে বাড়ির ঠিক ভিতের কাছে মৃত্যু যুবতীর দেহ পাওয়া গিয়াছে। এ কে রে পুলিস ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে ঘাড়ের কশেরু ভাঙিয়া মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুর কাল অনুমান একঘন্টা আগে, অর্থাৎ সাড়ে ছাঁটার সময়। এ কে রে তখন তিনতলার খোলা ছাদে গিয়া দেখিলেন, ছাদের মাঝখানে একটি ছোট মাদুরের আসন পাতা রহিয়াছে, তার পাশে এক জোড়া মেয়েলি চপ্পল। খবর লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, মেয়েটি প্রত্যহ সূর্য্যস্তের সময় ছাদে আসিয়া বসিত। সন্দেহ রহিল না যে আজও মেয়েটি ছাদে গিয়াছিল এবং ছাদ হইতে পড়িয়া মরিয়াছে।

বিবৃতি শেষ করিয়া এ কে রে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু তোমাকে খবর দিল কে?'

ব্যোমকেশ নেংটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ওই ছেলেটি। ওর নাম নেংটি দত্ত। ও আমার কাছে যাতায়াত করে। বোধহয় ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে ফোন করেছিল।'

নেংটি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকেই তাকাইয়াছিল, এ কে রে কিছুক্ষণ তাহাকে নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তা, তুমি এখন কি করতে চাও?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি আর করব। নেহাৎ পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই এসেছি, সত্যান্বেষী হিসেবে নয়। তোমার কী মনে হচ্ছে? অপঘাত মৃত্যু?

এ কে রে বলিলেন, 'অ্যাকসিডেন্টই মনে হচ্ছে। তবে—' তিনি বাক্যটি অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন, তাঁহার চোখে একটু হাসির আভাস দেখা দিল।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'বাড়ির সকলের জবানবন্দী নিয়েছ?'

এ কে রে বলিলেন, 'হ্যাঁ। কেবল গৃহস্বামীকে এখনো পাইনি। তিনি কোথায় তাও কেউ সুপ্রিয় না। শুনলাম উইক এন্ডএ তিন বাড়ি থাকেন না।' আবার তাঁহার চোখের মধ্যে হাসি ফুটিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'জবানবন্দীর নকল তৈরি হলে আমাকে এক কপি দেবে?'

এ কে রে বলিলেন, 'দেব। কাল বিকেলে পাবে। লাশ দেখতে চাও?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখতে পারি। ক্ষতি কি?'

যেখানে চাদর-ঢাকা মৃতদেহ পড়িয়াছিল। এ কে রে আমাদের সেখানে লইয়া গেলেন, চাদরের খুঁট ধরিয়া চাদর সরাইয়া দিলেন। আত্মজ্জ্বল আলোকে মৃত্যু হেনা মল্লিককে দেখিলাম।

সে রূপসী ছিল বটে, নেংটি মিথ্যা বলে নাই। গায়ের রঙ দুধে আলতা, ঘন সুকৃষ্ণ চুল অবিন্যস্ত হইয়া যেন মুখখানিকে আরো ঘনিষ্ঠ কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে, ভুরু দু'টি তুলি দিয়া আকা। চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত, গাঢ়-নীল চোখের তারা অর্ধেক দেখা যাইতেছে, দেহে ভরা যৌবনের উচ্ছলিত প্রগলভতা। মৃত্যু তাহার প্রাণটুকুই হরণ করিয়া লইয়াছে, দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, যৌবনের লাবণ্য তিলমাত্র চুরি করিতে পারে নাই। এই দেহ দুদিনের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ভাবিতেও কষ্ট হয়।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, হঠাৎ পিছন দিকে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। যুগল ও উদয় আমাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উদয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, সে যুগলের দিকে ফিরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, 'যুগল, তুই হেনাকে মেরেছিস।'

যুগল আগুন-ভরা চোখ তুলিয়া উদয়ের পানে চাহিল, শীর্ণ কঠিন স্বরে বলিল, 'আমি—হেনাকে-মেরেছি! মিথ্যেবাদী! তুই মেরেছিস।'

এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধকরি দুই ভাইয়ের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কিন্তু সিঁড়ির উপর উপবিষ্ট দু'টি স্ত্রীলোকই তাহা হইতে দিল না। শ্রীমতী চামেলি এবং চিংড়ি একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। চামেলি উদয়ের বুকে দু'হাত রাখিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতে দিতে তীক্ষ্ণ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন, হতভাগা! এসব কী বলছিস তুই! চলে যা এখান থেকে, নিজের ঘরে যা। হেনাকে কেউ মারেনি, ও নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে।'

ওদিকে চিংড়ি যুগলের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র-হ্রস্ব কণ্ঠে বলিতেছে, 'দাদা, দু'টি পায়ে পড়ি, চলে এস, এখানে থেকে না। চল তোমার শোবার ঘরে-লক্ষ্মীটি!'

যুদ্ধ থামিল বটে, কিন্তু দু'জনের কেহই ঘর ছাড়িয়া গেল না, রক্তিম চক্ষে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বা পুলিসের লোকেরা কেহই এই সহসা-স্ফরিত কলহ নিবারণের চেষ্টা করে নাই, সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় তাহারা প্রতীক্ষ্ণ করিতেছে এই ঝগড়ার সূত্রে যদি কোন গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঝগড়া যখন অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেল তখন এ কে রে উদয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, 'আপনি এখনি অভিযোগ করলেন যে, আপনার ভাই হেনাকে মেরেছে। এ অভিযোগের কোন ভিত্তি আছে কি?'

উদয় উত্তর দিল না, গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীমতী চামেলি তীব্রদৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া যেন মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইল।

সদর দরজার সামনে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মধ্যমাকৃতি মানুষ, একটু ভারী গোছের গড়ন, কিন্তু মোটা নয়; মুখে লালিত্য না থাক, দৃঢ়তা আছে। বেশভূষা একটু শৌখিন ধরনের, গিলেকরা পাঞ্জাবি ও কোঁচানো থান-ধুতির নীচে সাদা চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি। খবরের কাগজে তাঁহার অজস্র ছবি দেখিয়াছি; সুতরাং সন্তোষ সমাদ্দারকে চিনিতে কষ্ট হইল না। কিন্তু ছবিতে যাহা পাই নাই তাহা এখন পাইলাম, লোকটির একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি যেখানে উপস্থিত আছেন সেখানে তিনিই প্রধান, অন্য কেহ সেখানে কলকে পায় না।

তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমতী চামেলি বাঙুনিস্পত্তি করিলেন না, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া সুন্ন ক্ষক পরে উন্নয়ও উপরে চলিয়া গেল। বাকি সকলে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি যখন সন্তোষবাবুকে দেখিলাম তখন তিনি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চক্ষে ভূমি-শায়িত মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছেন। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি মৃতের পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের পেশীগুলি কঠিন হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি একবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আবার পরিষ্কার হইল। তিনি কাহাকেও

সম্বোধন না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'যাক, বাপ-মা-মেয়ে সবাই অপঘাতে গেল! আশ্চর্য ভবিতব্য।'

আশ্রিতা বন্ধুকন্যার মৃত্যুতে তিনি শোকে অভিভূত হইবেন কেহ প্রত্যাশা করে নাই, তবু তাঁহার এই অটল সংযমের জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না; একটু বেশি নীরস ও কঠিন মনে হইল। যাহোক, তিনি মৃতদেহ হইতে চক্ষু তুলিয়া একে একে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুতভাবে গলা-ঝাড়া দিয়া বলিল, 'অনাহূত অতিথি বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী, ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের আপনি চেনেন না, কিন্তু নেংটি—'

সন্তোষবাবু বলিলেন, না চিনলেও নাম জানি। নেংটি আপনাদের ডেকে এনেছে? তিনি নেংটির দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

নেংটি পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি-মাসিমা খুব ভয় পেয়েছিলেন—'

'বেশ করেছ তুমি ব্যোমকেশবাবুকে খবর দিয়েছ। বিপদের সময় বন্ধুর কথাই আগে মনে পড়ে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতার আভাস পাওয়া গেল, তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'নেংটি বুঝি আপনার বন্ধু?

ব্যোমকেশ বলিল, 'বলতে পারেন।'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'ভাল ভাল।' এ কে রে'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?'

এ কে রে বলিলেন, 'আর সব কাজই শেষ হয়েছে, লাশ চালান দিয়েই আমরা চলে যাব।'

কথাটা বোধহয় সন্তোষবাবুর মনে আসে নাই, তিনি থমকিয়া বলিলেন, 'ঠিক তো। পোস্ট-মর্টেম করতে হবে।' তিনি একবার চকিতের জন্য মৃতদেহের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমার কিছু বলবার নেই, আপনার যা কর্তব্য তাই করুন।'

তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইলে এ কে রে বলিলেন, 'যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে দুচারটে প্রশ্ন করতে চাই।'

সন্তোষবাবু থামিয়া গিয়া বলিলেন, 'আপত্তি কিসের? আপনারা বসুন, আমি এখনি আসছি। রবি, এঁদের খাবার-ঘরে বসাও। আর চিংড়ি, তুমি এঁদের জন্যে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর।'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। রবিবামী সামনে আসিয়া বলিল, 'আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

এ কে রে একজন অফিসারকে মৃতদেহের কাছে দাঁড় করাইয়া রবিবর্মার অনুসরণ করিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

পাঠকের সুবিধার জন্য এইখানে বাড়ির একটি প্ল্যান দেওয়া হইল।

সন্তোষবাবুর ভোজন-কক্ষটি বেশ বড়, লম্বা টেবিলে বারো-চৌদ্দ জন একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে। আমরা গিয়া চেয়ারগুলিতে উপবিষ্ট হইলাম। লক্ষ্য করিলাম, যুগলচাঁদ, নেংটি ও চিংড়ি আমাদের সঙ্গে আসে নাই। রবিবর্মা বসিল না, কর্তার আগমনের প্রতীক্ষয় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কে রে'র পাশের চেয়ারে ব্যোমকেশ বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'হেন মল্লিকের ঘরটা দেখেছি নাকি?'

এ কে রে বলিলেন, 'মোটামুটি দেখেছি! অতি সাধারণ একটা শোবার ঘর। আসবাবপত্রও বেশি কিছু নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিঠিপত্র?'

এ কে রে বলিলেন, 'এখনও ভাল করে দেখা হয়নি। যাবার আগে আর একবার দেখে যাব। তুমি দেখবে?

'দেখব।'

এই সময় যে অফিসারটি লাশ পাহারা দিতেছিল, সে আসিয়া এ কে রোর কানের কাছে খাটো গলায় বলিল, 'ভ্যান এসেছে, লাশ রওনা করে দেব?

এ কে রে বলিলেন, 'দাও।'

অফিসার চলিয়া গেল। আমরা নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলাম। খোলা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রবিবর্মা হল-ঘরের দিকে অপলক চাহিয়া ছিল, আমরা তাহার চক্ষু দিয়াই যেন মৃতদেহ স্থানান্তরণের কার্যটা দেখিতে পাইলাম। ক্ষণেকের জন্য তাহারা মঙ্গোলীয় চোখে একটা ক্ষুধিত অতৃপ্ত লালসা দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। এই পলিকের দৃষ্টি জানাইয়া দিয়া গেল, সেক্রেটারি রবিবর্মার মন হেনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল না।

০২. তারপর সন্তোষবাবু আসিয়া

তারপর সন্তোষবাবু আসিয়া টেবিলের শীর্ষস্থিত চেয়ারে বসিলেন। তিনি শৌখিন কেশ-বাস ত্যাগ করিয়া মামুলি আটপৌরে জাম-কাপড় পরিয়াছেন। উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'রবি, সিগারেট নিয়ে এস।'

রবিবর্মা তাড়াতাড়ি সিগারেট আনিতে গেল, সন্তোষবাবু এ কে রে'র পানে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি বোধহয় হেনা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করতে চান? দুঃখের বিষয়, তার কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না। মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাকে ভাল করে জানিবার সুযোগ হয়নি। একে তো আমি বাড়িতে কম থাকি, তাছাড়া হেনাও খুব মিশুকে মেয়ে ছিল না। যাহোক—'

রবিবর্মা সিগারেটের কৌটা ও দেশলাই আনিয়া সন্তোষবাবুর সম্মুখে রাখিল, তিনি কৌটার ঢাকা খুলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন—'আসুন।' সিগারেট লাইতে লইতে ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'শুনেছিলাম এ বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের জন্যে নিষিদ্ধ নয়।' তিনি নিজে একটা সিগারেট মুখে দিলেন, দেশলাই জ্বলিয়া আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

'এবার কি প্রশ্ন করবেন করুন।'

এ কে রে রাইটার জমাদারকে ইশারা করিলেন, সে খাতা-পেন্সিল বাহির করিল। তখন প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন : হেনার বাবার নাম কি?

উত্তর : কমল মল্লিক।

প্রশ্ন : কমল মল্লিক আপনার বন্ধু ছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। তাঁকে প্রায় পনেরো বছর ধরে চিনতাম। ব্যবসার সূত্রে আমাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হত, এখনো হয়। কমল মল্লিকের সঙ্গে ঢাকায় জানাশোনা হয়েছিল, তারপর ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়।

প্রশ্ন : তাহলে হেন কলকাতায় আসবার আগেও তাকে দেখেছেন?

উত্তর; অনেক বার। ওর তিন-চার বছর বয়স থেকে ওকে দেখছি।

প্রশ্ন; ওকে আশ্রয় দেবার ফলে বাড়িতে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল কি?

একটু থমকিয়া গিয়া সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আমার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শুচিবাই আছে; হেনা পাকিস্তানের মেয়ে, তার আচার-বিচার নেই, এই অছিলায় তিনি হেনাকে

নিজের হাঁড়ি-হেঁশেল থেকে খেতে দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে হেনার খাবার আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।'

প্রশ্ন; আর কেউ আপত্তি করেনি?

উত্তর : আর কারুর আপত্তি করার সাহস নেই।

প্রশ্ন : বাড়িতে কারুর সঙ্গে হেনার মেলামেশা ছিল না?

উত্তর : মেলামেশার বাধা ছিল না। তবে হেনা মিশুকে মেয়ে ছিল না, বাপ-মায়ের মৃত্যুর শকটাও বোধহয় সামলে উঠতে পারেনি। তাই সে একা-একাই থাকতো, নিজের ঘর ছেড়ে বড় একটা বেরতো না।

প্রশ্ন : সে রোজ সন্ধ্যেবেলা তেতলার ছাদে উঠে। বেড়াতে আপনি জানেন?

উত্তর : আগে জানতাম না, আজ জানতে পেরেছি।

প্রশ্ন; কার কাছে জানতে পারলেন?

উত্তর : যে আমাকে টেলিফোনে মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল তার কাছে।

প্রশ্ন: কে মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল?

সন্তোষবাবু কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'তাই তো, কে খবর দিয়েছিল তা তো লক্ষ্য করিনি। আমি যেখানে ছিলাম। সেখানকার ঠিকানাও তো কেউ জানে না।' তিনি হঠাৎ রবিবর্মার দিকে তীব্র চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'রবি।'

রবিবর্মা গাঢ়স্বরে বলিল, 'আর্জেজ্ঞ না, আমি ফোন করিনি।'

আমরা একবার মুখ তাকাতাকি করিলাম। এ কে রে বলিলেন, 'টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারেননি?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'খবরটা পাবার পর অন্য কোন প্রশ্ন মনেই আসেনি। কিন্তু–'

এ কে রে এবার অনিবার্য প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

সন্তোষবাবুর মুখে ঈষৎ রক্তসঞ্চার হইল, তিনি একে একে আমাদের সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, 'একথা জানা কি নিতান্তাই দরকার?'

এ কে রে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে প্রকাশ পাইল; তিনি অপ্রতিভভাবে বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু হেন মল্লিকের মৃত্যু সম্বন্ধে আমি এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি। খুব সম্ভব সে অসাবধানে ছাদ থেকে নিজেই পড়ে

গিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল— এ সম্ভাবনাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। তাই সব কথা আমাদের জানা দরকার।'

সন্তোষবাবু ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ এ কে রে'র পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'হেনকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এ সম্ভাবনাও আছে?'

এ কে রে বলিলেন, 'আজ্ঞে আছে।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ গলা চড়াইয়া বলিলেন, 'কিন্তু কে তাকে মারবে? কেন মারবে?'

এ কে রে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তা এখনো জানি না। কিন্তু সব সম্ভাবনাই আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।'

সন্তোষবাবু আবার কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সহসা খাড়া হইয়া বসিলেন; কড়া চোখে আমাদের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, 'বেশ, কোথায় ছিলাম বলছি। কিন্তু এটা আমার জীবনের একটা গুপ্তকথা, এ নিয়ে যেন কথা-চালাচালি না। হয়।'

'কথা-চালাচালি হবে না। আপনি যা বলবেন, অফ-রেকর্ড থাকবে।' এ কে রে অন্য পুলিস কর্মচারীদের ইশারা করিলেন, তাহারা উঠিয়া হল-ঘরে গেল, রাইটার জমাদারও

খাতা বন্ধ করিয়া শুনা করিল। ব্যোমকেশ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমরাও তাহলে পাশের ঘরে গিয়ে বসি।'

সন্তোষবাবু হাত তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'না, আপনারা বসুন। আপনি উপস্থিত আছেন ভালই হল, আমি আপনাকে আমার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত করলাম।'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িল। সন্তোষবাবু আর-একটা সিগারেট ধরাইয়া মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন, আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

চিংড়ি দ্বারের নিকট হইতে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা নিয়ে আসব?

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'এস।'

চিংড়ি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে খাবার ও চায়ের ট্রে লইয়া দুইজন ভৃত্য। চিংড়ি আমাদের সামনে চা ও জলখাবারের রেকবি রাখিতে রাখিতে একবার বিস্ময়ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। নেংটির নিকট নিশ্চয় ব্যোমকেশের পরিচয় শুনিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে কৌতূহল ছাড়াও এমন কিছু ছিল, যাহা নির্ণয় করা কঠিন। বোধহয় সে মনে মনে ভয় পাইয়াছে।

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদেরও দাও।'

চিংড়ি চাকরদের লইয়া হল-ঘরে গেল, রবিবর্মা বাহিরে গিয়া নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

আমরা পানাহারে মনোনিবেশ করিলাম। সন্তোষবাবু কেবল এক পেয়ালা চা লইয়াছিলেন, তিনি তাহাতে একটু মৃদু চুমুক দিয়া আমাদের দিকে না চাহিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন , 'আমি অকলঙ্ক চরিত্রের লোক নই, কিন্তু সেজন্যে নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষ দিই না। আমার অসংখ্য দোষের মধ্যে একটা দোষ, আমি কীর্তন শুনতে ভালবাসি।'

আমরা মুখ তুলিয়া চাহিলাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে সন্তোষবাবু বিখ্যাত বক্তা, তিনি যে তাঁহার গুপ্তকথা মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে বলিবেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না। বস্তুত তাঁহার প্রস্তাবনার বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর-এক চুমুক চা পান করিয়া তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিলেন, তারপর পেয়ালার মধ্যে সিগারেটের দগ্ধাংশ ফেলিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন,–

'কীর্তন-গাইয়ে সুকুমারীর নাম বোধহয় আপনারা শুনেছেন। গান গাওয়া তার ব্যবসা, টাকা নিয়ে সভায়-মজলিশে গান গায়। দশ বছর আগে তার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার দাম্পত্য-জীবন সুখের নয়, আমি সুকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তখন সুকুমারীর বয়স বাইশ-তেইশ বছর। কিছুদিন লুকিয়ে তার বাড়িতে যাতায়াত করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু তার বাড়িতে নানা রকম লোক

আসত, কেউ গান শুনতে আসত, কেউ বায়না দিতে আসত। দেখলাম, এখানে যাতায়াত করা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

'আপনারা জানেন, আমার জীবন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বাধীনতার যুদ্ধে দেশ-বিভাগের সময় দুই পক্ষের মধ্যে দূতের কাজ করেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার খ্যাতি আছে, প্রতিপত্তি আছে। তেমনি আবার শত্রুও আছে। শত্রুপক্ষ যদি আমার নামে কলঙ্ক রটাবার সুযোগ পায়, তাহলে আমার যশ পদমর্যাদা কিছুই থাকবে না। ভেবে-চিন্তে আমি এক কাজ করলাম, বেনামে একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিলাম। উদ্দেশ্য, সুকুমারীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলিব, তার প্রকাশ্য গায়িক-জীবন শেষ হবে। কিন্তু সুকুমারী তাতে রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল সে নিজের বাসাতেই থাকবে এবং গানের ব্যবসা চালাবে, কেবল হপ্তার মধ্যে দুদিন, শনিবার এবং রবিবার, সে আমার ভাড়া-করা গোপন বাড়িতে এসে থাকবে। আমি সেখানে এমনভাবে যাতায়াত করব যে কেউ জানতে পারবে না।

'গত দশ বছর ধরে এইভাবে চলেছে। আমি শনিবার বিকেলের দিকে অফিসের কাজ সেরে সেখানে চলে যাই, তারপর সোমবার সকালে সেখান থেকে সটান অফিসে যাই। আজও তাই হয়েছিল, বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর— রাত্রি আটটার সময় টেলিফোন পেয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এলাম।' তাঁহার মুখে নীরস ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল, 'এই আমার অ্যালিবাই।'

ব্যঙ্গের খোঁচা হজম করিয়া এ কে রে বিনীত স্বরে বলিলেন, ‘ধন্যবাদ। খৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আর দু-একটা প্রশ্ন করেই আপনাকে নিস্কৃতি দেব। ভাড়াটে বাড়িতে চাকর-বাকর কেউ আছে?

সন্তোষবাবু বলিলেন, ‘না, ইচ্ছে করেই চাকর রাখিনি। প্রত্যেক শনিবার দুপুরবেলা সুকুমারী নিজের বাসা থেকে ভাড়াটে বাসায় চলে আসে, ঘরদের পরিষ্কার করে রাখে। আমি বিকেলবেলা যাই। তারপর সোমবারে আমি অফিসে চলে যাবার পর, সে বাড়িতে তালা দিয়ে নিজের বাসায় ফিরে যায়। হাপ্তার বাকি দিন বাড়ি বন্ধ থাকে।’

প্রশ্ন : টেলিফোন রেখেছেন কেন?

উত্তর : নিজের জন্য নয়, সুকুমারীর জন্যে। সে যে-সময় ভাড়াটে বাড়িতে থাকে, সে-সময় নিজের বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়। কিন্তু প্রাইভেট নম্বর, ডিরেকটরিতে পাবেন না।

প্রশ্ন : সেক্রেটারিকে নম্বর বলেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কার জানা সম্ভব?

উত্তর : কারুর জানা সম্ভব নয়। আমি কাউকে বলিনি, সুকুমারীও কাউকে বলবে না।

প্রশ্ন : তাঁকে আপনি বিশ্বাস করেন?

উত্তর : করি। আমি তাকে মাসে হাজার টাকা দিই। সে নির্বোধ নয়, নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।

প্রশ্ন; আজ যখন টেলিফোন পেলেন, তখন আপনি কি করছিলেন?

উত্তর : কীর্তন শুনছিলাম। সুকুমারী চণ্ডীদাসের পদ গাইছিল।

এ কে রে ব্যোমকেশের পানে চক্ষু ফিরাইলেন; ব্যোমকেশ নিঃশব্দে মাথা নাড়িল, অর্থাৎ, আর কোন প্রশ্ন নাই। তখন এ কে রে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক। কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। আজ কি আপনি আবার–?'

'না, ফিরে যাব না, বাড়িতেই থাকব।' সন্তোষবাবুর গভীর চোখে কৌতুকের কটাক্ষ খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন, 'আমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে আমার বাসার সন্ধান পাবেন না।'

এ কে রে জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'না না, সে কি কথা! আপনার গুপ্ত বাসা সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র কৌতূহল নেই। আপনি যা বললেন, আমাদের তদন্তের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কেবল-শ্রীমতী সুকুমারীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে ভাল হত।'

'তাকে তার বাসার ঠিকানায় পাবেন।' সন্তোষবাবু সুকুমারীর ঠিকানা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'দশটা বাজে। আপনার কাজ বোধহয় এখনো শেষ হয়নি, যতক্ষণ দরকার থাকুন।। ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থাকবেন তো?'

'নিশ্চয়' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে বিশ্রাম করি গিয়ে। একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।'

তিনি দৃঢ়পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে ক্লান্তির কোন লক্ষণ চোখে পড়িল না। বোধহয় মনের ক্লান্তি। বাড়িতে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর–

সন্তোষবাবু যেভাবে তাঁহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ঢাকাঢাকা গুড়গুড় নাই, নিজের সম্বন্ধে সাফাই গাঁহিবার চেষ্টা নাই—জীবনের গূঢ় সত্য কথা যখন বলিতেই হইবে তখন স্পষ্টভাবে বলাই ভাল। তবু তাঁহার নির্মম সত্যবাদিতা আমার মনকে পীড়া না দিয়া পারিল না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী এবং ঝানু রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার চরিত্রে এই কালো দাগটা না থাকিলেই বোধহয় ভাল হইত।

এ কে রে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'অতঃপর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, হেনার ঘরটা একবার দেখে যাই।'

'চল।–ছাদে যাবে নাকি?'

'যাব। এসেছি। যখন, যা-যা দ্রষ্টব্য আছে সবই দেখে যাই।'

হল-ঘরের গোল টেবিলের কাছে বসিয়া পুলিসের বাকি কর্মচারীরা নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, রবিবর্মা ছাড়া বাড়ির লোক আর কেহ উপস্থিত ছিল না। হেনীর ঘর ডাইনিং-রুম হইতে কোনাকুনিভাবে হল-ঘরের অপর প্রান্তে। [প্ল্যান পশ্য]। হেনার ঘরের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, আলো জ্বলিতেছে। আমরা তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলাম। রবিবর্মা আমাদের পিছন পিছন আসিল।

ঘরটি বেশ বড়। সদরের দিকে ধনুরাকৃতি বড় জানালা, পূর্বদিকের দেয়ালেও একটি সাধারণ জানালা আছে। এই জানালার সামনে টেবিল ও চেয়ার, পাশে বইয়ের শেলফ। ঘরের অন্য পাশে সংকীর্ণ একহারা খাটের উপর বিছানা পাতা; খাটের নীচে বড় বড় দু'টি সুটকেস দেখা যাইতেছে। উত্তরদিকের দেয়ালের কোণে একটি সরু দরজা সংলগ্ন বাথরুমের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ঘরে আসবাবের বাহুল্য নাই, তাই ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে। সম্ভবত হেনাও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে ছিল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?'

এ কে রে বলিলেন, 'না, তালা লাগানো ছিল। মৃতদেহের হাতে একটা চামড়ার হ্যান্ড-ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে চাবির রিঙ পাওয়া গেছে। এই যে।' তিনি পকেট হইতে একটি চাবির গোছা বাহির করিয়া দিলেন।

চাবি হাতে লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হেনা তাহলে ঘরে তালা দিয়ে ছাদে গিয়েছিল।'

এ কে রে বলিলেন, 'তাই তো দেখা যাচ্ছে।'

রবিবর্মা মুখের সামনে মুষ্টি রাখিয়া কাশির মত একটা শব্দ করিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বলিল, 'হেনা দোর খুলে রেখে ঘর থেকে কখনো এক পা বেরুতো না, যখনি বেরুতে দোরে তালা দিয়ে বেরুতো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি? গোড়া থেকেই এই রকম, না, কোন উপলক্ষ হয়েছিল?'

'গোড়া থেকেই এই রকম।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না, চাবির রিঙ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'পাঁচটা চাবি রয়েছে দেখছি। একটা তো দোরের তালার চাবি। আর অন্যগুলো?'

এ কে রে বলিলেন, 'বাকিগুলোর মধ্যে দুটো হচ্ছে সুটকেসের চাবি। অন্য দুটো কোথাকার চাবি জানা গেল না।'

ব্যোমকেশ চাবিগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'একটা চাবিতে নম্বর খোদাই করা রয়েছে-৭ নম্বর। দেখ তো, এ চাবিটা কোথাও লাগে কি না।'

এ কে রে চাবিটি দেখিয়া বলিলেন, 'না। যে চাবি দুটোর তালা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তারই একটা।'

'টেবিলের দেরাজে। গা-তালা নেই?'

'আছে। কিন্তু দেরাজগুলো সব খোলা। চাবি নেই।'

'হুঁ।–কি মনে হয়?'

দু'জনে চোখে চোখে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, শেষে এ কে রে বলিলেন, 'বলা শক্ত। অনেক সময় দেখা যায়। তালা হারিয়ে গেছে, কিন্তু চাবিটা রিঙে রয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ রবিবর্মার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি কিছু বলতে পারেন?'

রবিবাম ঘাড় নাড়িল, 'এ-ঘরের ভিতরের কথা আমি কিছু বলতে পারি না। এই প্রথম ঘরে ঢুকলাম।'

ব্যোমকেশ গলার মধ্যে শব্দ করিল, চাবির গোছা এ কে রে-কে ফেরৎ দিয়া টেবিলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

একদিকে দেরাজযুক্ত টেবিল, লাল বনাত দিয়া ঢাকা, তাহার উপর দু-একটি বই ছাড়া আর কিছু নাই। তারপর চোখে পড়িল লাল বানাতের উপর একটি লাল গোলাপফুল পড়িয়া আছে। ঘরে ফুলদানি নাই, গোলাপফুলটা এমন অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে যে, আশ্চর্য লাগে।

ব্যোমকেশ ফুলটিকে স্পর্শ করিল না, সম্মুখে ঝুকিয়া সেটি ভালভাবে দেখিল, তারপর টেবিলের শিয়রে খোলা জানালার দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তাজা ফুল। বাগানে গোলাপফুল আছে?' জানালার বহিভাগের দৃশ্য অন্ধকারে দেখা যাইতেছিল না।

রবিবর্মা বলিল, 'আছে।'

ব্যোমকেশ এ কে রে-কে বলিল, 'গোলাপটা দেখে কী মনে হয়? এমনভাবে টেবিলের ওপর পড়ে আছে কেন?'

এ কে রে নীরবে জানালার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। হেনা যখন ঘরে ছিল না, সেই সময় কেউ বাগান থেকে ফুলটা তুলে জানালার গরাদের ফাঁকে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়েছে।' আমাদের সকলের চক্ষু রবিবর্মার দিকে ফিরিল, সকলের চোখে একই প্রশ্ন-কে ফেলতে পারে?

রবিবর্মা কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসু চক্ষু এড়াইয়া এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিল, শেষে বলিল, 'আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া দেরাজগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল, আমি বইয়ের শেলফের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দু-সারি বই। প্রথম সারিতে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, সত্যেন দত্তের কাব্যসঞ্চয়ন, নজরুলের সঞ্চিতা এবং আধুনিক লেখকদের রচিত কয়েকটি কথা ও কাহিনীর পুস্তক। দ্বিতীয় সারিতে অনেকগুলি ইংরেজি উপন্যাসের সুলভ সংস্করণ। হেনা বিদেশী রহস্য-রোমাঞ্চের বইও পড়িত।

'অজিত, দ্যাখো।'

আমি ফিরিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ দেরাজ হইতে একটি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়াছে এবং একদৃষ্টি তাহা দেখিতেছে। কার্ডবোর্ডের উপর আটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবিতে

কেবল একটি রমণীর প্রতিকৃতি! আমি এক নজর দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'হেনার ফটো।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না। ছবিটা কয়েক বছরের পুরনো, দেখছি না হলদে হয়ে গেছে, অথচ মহিলাটির বয়স পঁচিশের কম নয়। হেনা হতে পারে না, বোধহয় হেনার মা। হেনা এত রূপ কোথা থেকে পেয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।'

হেনাকে জীবিত অবস্থায় দেখি নাই, মৃতদেহ দেখিয়া রূপ অনুমান করিয়াছিলাম। এখন এই ফটো দেখিয়া মনে হইল, হেনাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতেছি। শুধু রূপ নয়, অফুরন্ত প্রাণশক্তি সর্বাঙ্গ দিয়া বিছুরিত হইতেছে।

ব্যোমকেশ ছবিটা এ কে রে-র হাতে দিয়া বলিল, 'এটা রাখো। সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে ছবিটা হেনার মায়ের কিনা।'

এ কে রে ছবিটি লইয়া চোখ বুলইলেন, রবিবর্মা গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। লোকটির চোখ-মুখ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু প্রাণে যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

এ কে রে ফটো পকেটে রাখিলেন, বলিলেন, 'আচ্ছা। দেরাজে আর কিছু পেলে?'

না। খুচরো দু-চারটে পয়সা আছে; এমন কিছু নেই। রবিবাবু, হেনার নামে চিঠিপত্র আসত কিনা। আপনি জানেন?'

রবিবর্মা বলিল, 'চিঠি আসার সময় আমি বাড়িতে থাকি না। নেংটি কিংবা চিংড়ি বলতে পারে।'

আর কিছু না বলিয়া ব্যোমকেশ বইয়ের শেলফের কাছে আসিল, বইগুলির মলাটের উপর একবার চোখ বুলাইয়া সঞ্চয়িতা বইখানি হাতে লইল। মলাট খুলিতেই দেখা গেল, এক টুকরা গোলাপী কাগজ ভাঁজের মধ্যে রহিয়াছে। কাগজের উপর চার ছত্র হাতের লেখা! ব্যোমকেশ কাগজটি দু' আঙুলে তুলিয়া ধরিয়া দেখিতেছে, রবিবর্মা বকের মত সেদিকে গলা বাড়াইল। ব্যোমকেশ কিন্তু তাহাকে লেখাটি পড়িতে দিল না, চট্ করিয়া কাগজ পকেটে পুরিল। রবিবর্মার মুখে ভাবোস্তর হইল না বটে, কিন্তু তাহার প্রাণটা যে ঐ লেখাটি পড়িবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা অনুমান করা শক্ত হইল না।

ব্যোমকেশ একে একে অন্য বইগুলি খুলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল, এ কে রে এবং আমি দুইপাশে দাঁড়াইয়া তাহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমাদের পিছনে রবিবাম অতৃপ্ত প্রেতীয়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমাদের পিছনে থাকিয়া সে দেখিতে পাইতেছে না। আমরা কি করিতেছি, তাই দুর্নিবার কৌতূহলে ছটফট করিতেছে। এত কৌতূহল কিসের?

উপরের থাকে বাংলা বইগুলিতে আর কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্ন মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে-হেন মল্লিক।

নীচের থাকের ইংরেজি বইগুলিতেও কাগজপত্র কিছু নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে ব্যোমকেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েকটি বইয়ের নাম-পৃষ্ঠায় রবারস্ট্যাম্প দিয়া ঢাকার একটি পুস্তক-বিক্রেতার নাম ছাপা আছে। এ কে রে ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, আমিও লু তুলিলাম। কিন্তু ব্যোমকেশ কিছু বলিল না; রবিবর্মার সান্নিধ্যবশতাই বোধহয় মুখ খুলিল না।

বই দেখা শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'সুটকেস দুটোতে কি আছে, খোল না একবার দেখি।'

এ কে রে চাবির গোছা বাহির করিয়া সুটকেস দু'টি খুলিলেন। দেখা গেল, তাদের মধ্যে নানা জাতীয় মেয়েলি পোশাক থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। শাড়ি-স্কার্ট-ঘাঘরাওড়না-কামিজ-পায়জামা প্রভৃতি সর্বজাতীয় পরিচ্ছদ। সবই দামী জিনিস। ব্যোমকেশ সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না, কাজের জিনিস কিছু নেই। বাথরুমটা তো তুমি দেখেছ?'

এ কে রে বলিলেন, 'দেখেছি। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই।'

'আমিও একবার দেখে যাই।' ব্যোমকেশ বাথরুমে প্রবেশ করিল। মিনিট দুই-তিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল, এবার ছাদে যাওয়া যাক।'

ঘরের দরজা হইতে কয়েক পা সামনের দিকে সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। বেশ চওড়া বাহারে সিঁড়ি। ব্যোমকেশ সিঁড়ির নীচের ধাপে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, রবিবাবু, আপনি আর আমাদের সঙ্গে আসবেন না, ছাদ আমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারব।' কথাগুলি বলার ভঙ্গীতে এমন একটি দৃঢ়তা ছিল যে, রবিবর্মা আর অগ্রসর হইল না, সিঁড়ির পদমূলে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

দোতলাকে স্পর্শ করিয়া সিঁড়ি তেতলায় উঠিয়া গিয়াছে, মোড় ঘুরিয়াব্র সময় দ্বিতল যতখানি দেখা গেল এক নজরে দেখিয়া লইলাম। হল-ঘরের উপরে অবিকল আর একটি হল-ঘর, সামনের দিকে দুই কোণে দু'টি ঘর। তফাৎ এই যে, নীচের তলায় পিছনের দেয়ালের দরজা ছিল না, দ্বিতলে সারি সারি তিনটি দরজা। অথাৎ, নীচের রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর প্রভৃতির উপরে কয়েকটি শয়নকক্ষ, দরজাগুলি উপরের হল-ঘরের সহিত তাহদের যোগসাধন করিয়াছে।

ত্রিতলে সিঁড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বন্ধ দ্বার। এ কে রে ছিটিকিনি খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং দ্বারের পাশে একটি সুইচ টিপিয়া ছাদের আলো জ্বলিলেন; ফ্লাড় লাইটের আলোয় প্রকাণ্ড ছাদ উদভাসিত হইল।

আমরা তিনজনে ছাদে পদার্পণ করিলাম। ব্যোমকেশ প্রথমেই দরজাটা পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ভিতরে এবং বাইরে দুদিক থেকেই দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে দেখছি; ভিতরে ছিটিকিনি বাইরে শিকল। এ কে রে, তুমি যখন ছাদে এসেছিলে তখন কি দরজা বন্ধ ছিল?'

এ কে রে বলিলেন, 'না, দুদিক থেকেই খোলা ছিল।'

বৈদ্যুতিক বন্যালোক তো ছিলই, উপরন্তু এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র মাথা তুলিয়াছে। আমরা ছাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

ছাদটি প্রকাণ্ড, ইহার উপর সুন্দর একটি টেনিস-কোর্ট তৈরি করা চলে। ছাদ ঘিরিয়া নিরেট গাঁথুনির আলিসা, আলিসার গায়ে বাহির হইতে বাঁশের ডগা উচু হইয়া আছে, কেবল পূর্বদিকে

দূরে বাগানের সীমানায় একসারি দীর্ঘ সিলভার পাইনের গাছ। সমব্যবধানে দাঁড়াইয়া বাড়িটিকে যেন প্রহরীর মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ছাদ হইতে তাহাদের উধ্বঙ্গি মন্দিরের চুড়ার মত দেখাইতেছে।

ব্যোমকেশ একবার চারিদিকে মুণ্ড ঘুরাইয়া সমগ্র দৃশ্যটা দেখিয়া লইল, তারপর তাহার দৃষ্টি ছাদের অভ্যন্তরে ফিরিয়া আসিল। ছাদে অন্য কিছু নাই, কেবল মধ্যস্থলে একটু পশ্চিমদিকে ঘেঁষিয়া একটি মাদুর পাতা রহিয়াছে এবং তাহার পাশে একজোড়া মেয়েলি চটিজুতা।

একটি চিত্র মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল; হেনা ছাদে আসিয়া মাদুর পাতিল, চটিজুতা খুলিয়া তাহার উপর বসিল। তারপর-?

রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হেনা কোন দিকে পড়েছিল?'

যেদিকে ভারা বাঁধা নাই সেই দিকে নির্দেশ করিয়া এ কে রে বলিলেন, 'এই দিকে।'

তিনজনে পূর্বদিকের আলিসার কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সামনেই চাঁদ। পঁচিশ হাত দূরে পাইনগাছের সারি মৃদু বাতাসে মর্মরধ্বনি করিতেছে, যেন হেনার অপমৃত্যু সম্বন্ধে হ্রস্বকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে। তাহারা যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত বোধহয় প্রত্যক্ষদশীর সাক্ষ্য পাইতাম। 'ঐখানে পড়েছিল!' এ কে রে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম। পাইনগাছের ছায়ায় বিশেষ কিছু দেখা গেল না। আলিসাটা আমার কোমর পর্যন্ত উঁচু, এক ফুট চওড়া। হেনা আমার চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোটই ছিল নিশ্চয়, সে যদি কোনো কারণে নীচের দিকে উঁকি মারিয়াও থাকে, আলিসা ডিঙাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম।

ব্যোমকেশও বোধকরি মনে মনে মাপজোক করিতেছিল, এ কে রে'র দিকে ফিরিয়া বলিল, 'হুঁ। আলসের খাড়াই আন্দাজ চার ফুট। হেনরি খাড়াই কত ছিল?

এ কে রে ব্যোমকেশের মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন, 'আন্দাজ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। কিন্তু তাহলেও অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব বলিনি।' ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে আলিসার ধারা দিয়া পরিক্রমণ করিল। ভারাগুলি মাটি হইতে ছাদ পর্যন্ত মই রচনা করিয়াছে, একটু শক্ত-সমর্থ মানুষ সহজেই মই দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে পারে।

ছাদ পরিদর্শন শেষ করিয়া ব্যোমকেশ ঈষৎ নিরাশ স্বরে বলিল, অনেক রাত হয়েছে, আজ এই পর্যন্ত থাক। —হেনীর ঘরটা কি সীল করবে?'

এ কে রে বলিলেন, 'সীল করার দরকার দেখি না। ও-ঘরে হেনার মৃত্যুর হয়নি। উপরন্তু আমরা দু'জনেই ঘরটা খানাতল্লাশ করেছি।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। এ কে রে আলো নিভাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলেন, আমরা তাঁহার পিছনে চলিলাম।

নিঃশব্দে নামিতেছি। দ্বিতল পর্যন্ত নামিয়া মোড় ঘুরিবার উপক্রম করিতেছি, পাশের দিক হইতে একটা চাপা তীক্ষ্ণ স্বর কানে আসিল—'তুমি চুপ করে থাকবে, কোনো কথা কইবে না।'

চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি দ্বিতলে হল-ঘরের অন্য প্রান্তে রবিবর্মার্ণ ও শ্রীমতী চামেলি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছেন। রবিবর্মা আমাদের দেখিতে পাইয়া বোধহয় নিঃশব্দে শ্রীমতী চামেলিকে ইশারা করিল, তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর ধারালো চোখে প্রখর অসহিষ্ণুতা ফুটাইয়া তিনি দ্রুতপদে পিছনের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশ এ কে রে'র দিকে বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'শুনলে?'

এ কে রে একটু ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন, 'চল, পুলিস-ভ্যানে তোমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।'

০৩. পরদিন রবিবার সকাল সাতটার সময়

পরদিন রবিবার সকাল সাতটার সময় ব্যোমকেশ ও আমি সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছি, হুড়মুড় শব্দে নেংটি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশদা, ভীষণ কাণ্ড!'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'ভীষণ কাণ্ড!'

নেংটি বলিল, 'হ্যাঁ। একটা সিগারেট দিন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট দিল, নেংটি তাহা ধরাইয়া দুই-তিনটা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'কাল রাত্তিরে হেনার ঘরটা কে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

আমি বলিলাম, 'অ্যাঁ! বাড়ি পুড়ে গেছে!'

নেংটি বলিল, 'বাড়ি নয়, শুধু হেনার ঘরটা পুড়েছে। খাট-বিছানা, টেবিল-আলমারি কিছু নেই, সব ছাই হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, শেষে বলিল, 'রাত্তিরে কখন তোমরা জানতে পারলে?'

নেংটি বলিল, 'আমরা রাত্তিরে জানিব কোথেকে, আমরা তো দোতলায় শুই। রবিবর্মা নীচের তলায় শোয়, সে-ই কিছু জানতে পারেনি। একেবারে সকালবেলায় জনাজানি হল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, বাড়িতে চেঁচামেচি হৈ হৈ চলছে। আমি স্যুট করে পালিয়ে এসেছি আপনাকে খবর দিতে।'

'হুঁ। কে ঘরে আগুন দিতে পারে, বাড়ির লোক না বাইরের লোক?'

'তা আমি কি করে বলব? রাত্তিরে নীচের তলার দরজা-জানালা সব বন্ধ থাকে।'

'সকালে যখন দেখলে তখন কি হেনার ঘরের জানোলা দুটো খোলা ছিল?'

'দরজা-জানালা সব পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে, খোলা ছিল কি বন্ধ ছিল বোঝবার উপায় নেই। তবে–' বলিয়া নেংটি থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তবে কি?'

নেংটির সিগারেট আধাআধি পুড়িয়ছিল, বাকি অর্ধেক নিভাইয়া সে সযত্নে পকেটে রাখিল , বলিল, 'সিঁড়ির তলায় এক টিন পেট্রোল রাখা থাকতো, দেখা গেল টিন খালি।'

'তার মানে—' ব্যোমকেশ কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

নেংটি উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আমি পালাই। মাসিমা যদি জানতে পারে আমি বাড়ি নেই, রক্ষে থাকবে না।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল, 'বোসো। তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

নেংটি অনিচ্ছাভরে বসিয়া বলিল, 'আর কি জিজ্ঞেস করবেন, যা জানি সব বলেছি। এবার আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে বের করুন, কে খুন করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুন করেছে তার কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে যাক। যে-সময় হেনা ছাদ থেকে পড়ে যায় সে-সময় তুমি কোথায়?'

নেংটি বলিল, 'আমি বাড়ির মধ্যে ছিলাম না, সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলাম।'

'কি করে জানলে যে, তুমি যখন সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলে ঠিক সেই সময় হেনা ছাদ থেকে পড়ে যায়?'

'শুনুন। সাড়ে পাঁচটার একটু আগে আমি যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, তখন হেনার ঘরের দোর একটু ফাঁক হয়ে ছিল, দেখলাম সে খাটে বসে কাঠি দিয়ে পশমের গেঞ্জি বুনছে। আধঘণ্টা পরে যখন ফিরে এলাম, তখন বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড, সবেমাত্র হেনরি লাশ পাওয়া গেছে।'

'কে লাশ পেয়েছিল?'

'রবিবর্মা।'

'তুমি যখন বেরুচ্ছিলে তখন হল-ঘরে আর কেউ ছিল?'

'উদয়দা ছিল, আর কেউ ছিল না।'

'তুমি যখন সিগারেট খেয়ে ফিরে এলে তখন বাড়ির সবাই বাড়িতেই উপস্থিত ছিল?'

নেংটি একটু ভাবিয়া বলিল, 'মেসোমশাই ছাড়া আর সবাই উপস্থিত ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর বলিল, 'আর একটা কথা। হেনার চিঠিপত্র আসতো। কিনা জানো?'

নেংটি দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আসতো না। সকাল বিকেল যখনই চিঠি আসে, আমি পিওনের হাত থেকে চিঠি নিই। হেনার নামে একটাও চিঠি আজ পর্যন্ত আসেনি।'

বাইরের কারুর সঙ্গে হেনার কোন যোগাযোগ ছিল না?'

নেংটি মাথা নাড়িতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কী?'

নেংটি বলিল, 'কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ব্যোমকেশদা। তুচ্ছ কথা বলেই বোধহয় মনে ছিল না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হোক তুচ্ছ, বলে শুনি।'

নেংটি ধীরে ধীরে ভাবিয়া ভাবিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'হেনা আসবার দশ-বারো দিন পর থেকেই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়। আমাদের রাস্তায় বেশি গাড়ি-মোটরের চলাচল নেই, নির্জন বড়মানুষের পাড়া। একদিন বিকেলবেলা একটা ট্যাক্সি আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল, তার ভেতরে একটা লোক বসে মাউথ-অগনি বাজাচ্ছে। মাউথ-অগনি জানেন তো। চশমার খাপের মত দেখতে, ঠোঁটের ওপর ঘষলে প্যাপপো পাপপো করে বাজে-খুব জোর আওয়াজ হয়—'

'জানি। তারপর বলে।'

ট্যাক্সি চলে গেল, দুতিন মিনিট পরে আবার উল্টে দিক থেকে মাউথ-অগনি বাজাতে বাজাতে বাড়ির সামনে দিয়ে গেল। এই ঘটনার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে হেনা ঘরে তালা লাগিয়ে বেরুলো। আমি প্রথমবার যোগাযোগটা বুঝতে পারিনি—'

'যে লোকটা মাউথ-অগনি বাজাচ্ছিল তাকে দেখেছিলে?'

'দেখেছিলাম। কোট-প্যান্ট-পরা একটা লোক।'

'তারপর!'

'তারপর দশ-বারো দিন চুপচাপ, হেনা বাড়ি থেকে বেরুলো না। একদিন আমি দোতলার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তার ভেতর থেকে মাউথ-অগনি বেজে উঠলো, আবার বাড়ি পার হয়েই থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি ফিরে এল, বাড়ির সামনে আর একবার প্যাপপো পাপপো বাজিয়ে চলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, কী ব্যাপার, আমাদের বাড়ির সামনেই মাউথ-অগনি বাজায় কেন? এমন সময় দেখি, হেনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেদিকে ট্যাক্সি গেছে। সেই দিকে চলে গেল। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কেউ হেনাকে ইশারা করে যায়, অমনি হেনা তার সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়।'

''হেনা কখন ফিরে আসতো?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে আসতো।'

'কোথায় যায় তুমি জানো?'

'কি করে জানব? একবার হেনার পিছু নিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে শাখানেক গজ দূরে রাস্তার ধারে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল, হেনা টুক করে তাতে উঠে পড়ল, ট্যাক্সি চলে গেল।'

'হুঁ। শেষবার কবে হেনা বেরিয়েছিল?'

'দশ-বারো দিন আগে। —আচ্ছা ব্যোমকেশদা, আজ তাহলে আমি পালাই, বডড দেরি হয়ে গেল। সুবিধে পেলেই আবার আসব।'

'আচ্ছা, এস।'

নেংটি চলিয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে আমি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, 'কি বুঝছ?'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'মাউথ-অগানের ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে, কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যায়। হেনা কলকাতা শহরে নেহাৎ একলা ছিল না! যাহোক, হেনার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া গেল; অপঘাত মৃত্যু নয়, তাকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন–মগ্নমৈনাকটি কে?'

বলিলাম, 'ঘরে যে আগুন লাগিয়েছিল সে-ই নিশ্চয়।'

কথাটা ব্যোমকেশের মনঃপূত হইল না, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝে দেখ। একটা লোক হেনাকে খুন করেছে, তার মোটিভ আমরা জানি না। যৌন-ঈর্ষা হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু যে-লোকটা ঘরে আগুন দিয়েছে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; হেনার ঘরে এমন একটা মারাত্মক জিনিস আছে যা সে নষ্ট করে ফেলতে চায়। আমরা ঘরটা একবার মোটামুটি রকম তল্লাশ করেছি, কিন্তু মারাত্মক কিছু পাইনি। আবার তল্লাশ করে যদি মারাত্মক বস্তুটি খুঁজে পাই! অতএব পুড়িয়ে শেষ করে দাও।'

'কী মারাত্মক জিনিস হতে পারে?'

'হয়তো কাগজ, এক টুকরো কাগজ। বড় জিনিস হলে আমরা খুঁজে পেতাম।'

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, সেই গোলাপী কাগজের টুকরো! তাতে কি লেখা আছে?'

ব্যোমকেশ দেরাজ হইতে কাগজের টুকরাটি বাহির করিয়া দিল, বলিল, 'কবিতা। পড়ে দেখ দেখি, কাব্য হয়েছে কি না।'

কবিতা পড়িলাম–

তোমার হাসির ঝিলিকটুকু
ছুরির মত রইল বিঁধে বুকে
বিনা দোষে শাস্তি দিতে
পারে তোমার ঠোঁটদুটি টুকটুকে।

বলিলাম, মন্দ নয়, অনেকটা সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার মত। কে লিখেছে?

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওদের বাড়িতে কবি একজনই আছে-যুগল।'

অপরাহ্নে এ কে রে স্বয়ং জবানবন্দীর নকল লইয়া আসিলেন।

আজ তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সঙ্গে ফষ্টি-নিষ্টি করিলেন, দুই চারিটা মজাদার গল্প বলিলেন, ব্যোমকেশ যে পুলিসে যোগ না দিয়া শূন্যোদরে বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতেছে তাহা প্রমাণ করিলেন, সময়োচিত পানাহার গ্রহণ করিলেন; তারপর কাজের কথায় উপস্থিত হইলেন। জবানবন্দীর ফাইল ব্যোমকেশকে দিয়া বলিলেন, 'এই নাও, পড়ে দেখতে পার। কিন্তু তোমার কোন কাজে লাগবে না।'

ভু তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাজে লাগবে না কেন?

এ কে রে বলিলেন, 'পুলিস-দপ্তরের মতে হেনীর মৃত্যু অপঘাত ছাড়া আর কিছু নয়, তদন্ত চালানো নিরর্থক।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আগুন লাগার খবর পেয়েছ?'

এ কে রে বলিলেন, 'পেয়েছি। ওটা সমাপতন। ইচ্ছে করে কেউ আগুন লাগিয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই।'

ব্যোমকেশ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, 'তাহলে সন্তোষবাবু আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, সেটা গেল। তাঁর পরিবারিক স্বার্থরক্ষার আর দরকার নেই।'

এ কে রে হাসিয়া বলিলেন, 'না। তুমি তাঁকে আশ্বাস দিতে পোর পুলিস তাঁর পরিবারের ওপর আর কোনো জুলুম করবে না। —ভাল কথা, আগুন লাগার খবর পেয়ে আমি সন্তোষবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি উপস্থিত ছিলেন। কাল হেনার দেরাজের মধ্যে যে ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তাঁকে দেখলাম। তিনি বললেন, ওটা হেনার মায়ের ছবি।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, বলিল, 'ময়না তদন্তে কী পেলে?'

এ কে রে বলিলেন, 'এ রকম অবস্থায় যা আশা করা যায়। তার বেশি কিছু নয়। পাঁজরার একটা হাড় ভেঙ্গে হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। অন্য কোন জটিলতা নেই।'

'মৃত্যুর সময়?'

'সাড়ে পাঁচটা থেকে ছাঁটার মধ্যে।'

তারপর এ কে রে দু' একটা হাসি-তামাশার কথা বলিয়া ব্যোমকেশের পিঠ চাপড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কে রে কি খুব বুদ্ধিমান লোক?'

ব্যোমকেশ আমার পানে চোখ তুলিয়া বলিল, 'ওর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়।'

বলিলাম, 'দোষের মধ্যে পুলিস।'

'হ্যাঁ, দোষের মধ্যে পুলিস।' ব্যোমকেশ জবানবন্দীর ফাইলটা তুলিয়া লইল।

আধঘণ্টা পরে জবানবন্দী পাঠ শেষ করিয়া সে ফাইল আমাকে দিল, বলিল, 'বিশেষ কিছু নেই, দেখতে পারো।–আমি একটু ঘুরে আসি।'

‘কোথায় যাচ্ছ?

‘অনেক দিন দোকানে যাওয়া হয়নি, যাই দেখে আসি প্রভাত কি করছে।’

সে চলিয়া গেল। আমি ফাইল খুলিয়া জবানবন্দী পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

রবীন্দ্রনাথ বর্মণ। বয়স ৩৯। সন্তোষ সমাদ্দারের অন্যতম সেক্রেটারি। সন্তোষবাবুর বাড়িতে থাকেন। বেতন ৩৫০ টাকা।

আজ শনিবার। কত অফিস থেকে চলে যাবার পর আমি আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় ফিরে আসি। হেনা তখন কোথায় ছিল আমি লক্ষ্য করিনি। সম্ভবত নিজের ঘরেই ছিল।

আমি কিছুক্ষণ নিজের ঘরে বিশ্রাম করলাম। সাড়ে চারটের সময় চাকর চা-জলখাবার এনে দিল, আমি খেলাম। তারপর পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরুলাম। বাজারে কিছু কেনাকাটা করবার ছিল, সাবান টুথপেস্ট দাড়ি কামাবার ব্লেড অ্যাসপিরিন, এই সব।

আমি যখন বেরুই, তখন হল-ঘরে কেবল একজন মানুষ ছিল-উদয়। তার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি, সে কিছুই করছিল না, বুকে হাত বেঁধে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উদয় কলেজে পড়ে। বইকি, তবে যখন ইচ্ছে চলে আসে, পড়াশুনোয় মন নেই।

আমি বাজার করে ফিরলাম ছাঁটার সময়। তখনো অন্ধকার হয়নি, আমি নিজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে পুবদিকের গোলাপ-বাগানে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়াবার পর হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ির কোলে মানুষের চেহারার মত কি যেন একটা পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি-হেনা।

চেঁচামেচি করে লোক ডাকলাম। চাকরেরা ছুটে এল, যুগল আর উদয়ও এল-হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই বাড়িতে ছিল। সবাই মিলে ধরাধরি করে লাশ বাড়িতে নিয়ে এলাম, তারপর পুলিসকে ফোন করলাম। না, কর্তা বাড়িতে ছিলেন না। শনিবার-রবিবার তিনি বাড়িতে থাকেন না। কোথায় থাকেন আমি জানি না।

যুগলচাঁদ সমাদ্দার। বয়স ২০। সন্তোষ সমাদ্দারের পুত্র।

আমি কলেজে পড়ি। আজ দুটোর পর ক্লাস ছিল না, তাই তিনটের সময় বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমার ঘর দোতলায়, রবিবর্মার ঘরের ওপরে।

ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল একেবারে সাড়ে পাঁচটার সময়ে। তাড়াতাড়ি উঠে নীচে নেমে গেলাম। না, হল-ঘরে কেউ ছিল না। আমি গোলাপ-বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বেড়ালাম, তারপর ফিরে এসে দোতলায়

গেলাম। চিংড়ি আমাকে চা-জলখাবার এনে দিল, আমি খেলাম। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করতে বসলাম।

বাগানে আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না, পনেরো-কুড়ি মিনিট ছিলাম। ধরুন, সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌঁনে ছটা পর্যন্ত। না, রব্বিমাকে বাগানে দেখিনি। বাড়ির পাশে হেনার মৃতদেহ দেখিনি। ছাঁটার পর নীচে চেঁচামেচি শুনে আমি নেমে এলাম। ওরা তখন হেনার মৃতদেহ বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসছে।

আমার সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কারুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সে কারুর সঙ্গে মিশতো না।

উদয়চাঁদ সমাদ্দার। বয়স ২০। সন্তোষ সমাদ্দারের পুত্র।

আজ আমি কলেজে যাইনি। দুপুরবেলা বিলিয়ার্ড খেলতে ক্লাবে গিয়েছিলাম। ক্লাবের নাম গ্রেট ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব।

সাড়ে চারটের সময় আমি বাড়ি ফিরেছি। দোতলায় হেনার ঘরের ওপর আমার ঘর। আমি নিজের ঘরে গেলাম, কাপড়-চোপড় বদলে নীচের হল-ঘরে নেমে এলাম। কেন নেমে এলাম তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আমার বাড়ি, আমি যখন যেখানে ইচ্ছা থাকি।

প্রশ্ন : আপনি যতক্ষণ হল-ঘরে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে হল-ঘরে দেখেছিলেন?

উত্তর: রবিবর্মা নিজের ঘরে ছিল, মাঝে মাঝে হল-ঘরে আসছিল। সে আন্দাজ পাঁচটার সময় বেরিয়ে গেল।

প্রশ্ন: আর কেউ?

উত্তর : নেংটি ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল, আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

প্রশ্ন : হেনা তখন কোথায় ছিল?

উত্তর: নিজের ঘরে।

প্রশ্ন : আপনি হল-ঘরে থাকতে থাকতেই হেনা ছাদে যাবার জন্যে নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তার হাতে কিছু ছিল?

উত্তর; একটা ছোট মাদুর ছিল। ভ্যানিটি-ব্যাগ ছিল।

প্রশ্ন : আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

উত্তর : নো কমেন্ট।

প্রশ্ন : হেনা চলে যাবার পর আপনি হল-ঘরে কতক্ষণ ছিলেন?

উত্তর: পাঁচ মিনিট।

প্রশ্ন : তারপর কোথায় গেলেন?

উত্তর: নিজের ঘরে।

প্রশ্ন : হেনার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল?

উত্তর : নো কমেন্ট।

শ্রীমতী চামেলি সমাদ্দার। বয়স ৪৪। সন্তোষ সমাদ্দারের স্ত্রী।

ছ'মাস আগে হেনা মল্লিক। আমার বাড়িতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ ছিল না, তাকে কখনো দোতলায় উঠতে বলিনি। আমি মুখ দেখে মানুষ চিনতে পারি, হেনা ভাল মেয়ে ছিল না। আমার স্বামী কেন তাকে বাড়িতে এনেছিলেন। আমি জানি না। আমি বিরক্ত : হয়েছিলাম। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, আমি কী করতে পারি। হেনাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়নি, কোন কথাই হয়নি।

আমার দুই ছেলেই ভাল ছেলে, সচ্চরিত্র ছেলে। হেনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, উটুকো মেয়ের সঙ্গে তারা মেলামেশা করে না।

আজ পাঁচটা থেকে ছাঁটার মধ্যে আমি চিংড়ির চুল বেঁধে দিয়েছিলুম, চিংড়ি আমার চুল বেঁধে দিয়েছিল, তারপর আমি বাথরুমে গা ধুতে গিয়েছিলুম! হেনাকে তেতলার ছাদে যেতে দেখিনি, ছাদের ওপর কোন শব্দ শুনিনি।

শেফালিকা, ওরফে চিংড়ি। বয়স ১৫। সন্তোষবাবুর গৃহে পালিত। দু'বছর আগে আমাদের মা-বাবা মারা যান। সেই থেকে দাদা আর আমি মাসিমার কাছে আছি।

হেন যখন এ-বাড়িতে এসেছিল, তখন তাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এত সুন্দর মেয়ে আমি দেখিনি। আমি একবার গিয়েছিলুম ভাব করতে, কিন্তু সে আমার

মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দিল। সেই থেকে আমি আর ওর কাছে। যাইনি, মাসিমা মানা করে দিয়েছিলেন। ওকে দু-একবার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে ও ভালভাবে কথা বলত। দশ-বারো দিন অন্তর ভাল কাপড়-চোপড় পরে বাইরে যেত। কোথায় যেত। জানি না। একলা যেত, আবার ঘন্টাখানেক পরে ফিরে আসত। হ্যাঁ, রোজ সন্ধ্যার সময় হেনা ছাদে যেত, সেখানে একলা কি করত। জানি না; বোধহয় পায়চারি করত, কিংবা মাদুর পেতে বসে থাকত। মাসিমার বিশ্বাস, হেনা ছাদে গিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত।

আমি স্কুলে পড়ি না, মাসিম আমাকে স্কুলে পড়তে দেননি। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজে পড়লে মেয়েরা বিগড়ে যায়, সিগারেট খেতে শেখে। আমি মাসিমার কাছে ঘর-কান্নার কাজ শিখেছি।

আজ বিকেলবেলা মাসিম আমার চুল বেঁধে দিলেন, আমি মাসিমার চুল বেঁধে দিলুম; তারপর মাসিম বাথরুমে গেলেন। আমি দাদাদের জলখাবার দিতে গেলুম। যুগলদা নিজের ঘরে ছিলেন, তাঁকে খাবার দিয়ে উদয়দা'র ঘরে গেলুম। উদয়ন্দা ঘরে ছিলেন না; তাঁর টেবিলে খাবার রেখে আমি চলে এলুম। তারপর আমিও বাথরুমে গা ধুতে গেলুম। দোতলায় পাঁচটা বাথরুম আছে।

না, হেনা কখন ছাদে গিয়েছিল। আমি জানতে পারিনি। ছাদের ওপর শব্দ শুনিনি। বাথরুম থেকে বেরুবার পর নীচের তলা থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেলুম, জানতে পারলুম হেনা ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে।

নির্মলচন্দ্র দত্ত, ওরফে নেংটি। বয়স ১৭। সন্তোষবাবুর গৃহে পালিত।

চিংড়ি আমার বোন। আমরা মা-বাবার মৃত্যুর পর থেকে মাসিমার কাছে আছি। আমি লেখা পড়া করি না। মেসোমশাই বলেছেন, আমার আঠারো বছর বয়স হলে তিনি তাঁর কোম্পানিতে চাকরি দেবেন।

হেনা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু ভারি অহংকারী ছিল, আমার সঙ্গে কথাই বলত না। বাড়িতে কেবল মেসোমশাইয়ের সঙ্গে হেসে কথা বলত, যুগলদা আর উদয়দা'র সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলত। হেনা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তখন হেনা নিজের ঘরে ছিল। ছটার পর ফিরে এসে শুনলাম সে ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

জবানবন্দী পড়া শেষ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিলাম। এই কয়জনের মধ্যেই কেহ হেনাকে ছাদ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল মনে হয় না। উদয় ছেলেটা একটু উদ্ধত, কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। সত্যিই কি কেহ হেনাকে ছাদ হইতে ফেলিয়া

দিয়াছিল? হয়তো পুলিসের অনুমানই ঠিক, ব্যোমকেশ ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখিতেছে। কিন্তু ঘরে আগুন লাগাও কি আকস্মিক?

নেংটি একটা লোকের কথা বলিল, হেনা দশ-বারো দিন অন্তর মাউথ-অগানের বাজনা শুনিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত। লোকটা কে? সে-ই কি কোন অজ্ঞাত কারণে হেনাকে খুন করিয়াছে? সন্তোষবাবুর তেতলার ছাদটি অবস্থা গতিকে বাহিরের লোকের পক্ষে সহজগম্য হইয়া পড়িয়াছে, ভারার মই বাহিয়া যে কেহ ছাদে উঠিতে পারে; অর্থাৎ, বাড়ির লোক এবং বাহিরের লোক সকলেরই ছাদে উঠিবার সমান সুবিধা।

সান্ধ্য চায়ের সময় হইলে ব্যোমকেশ ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দোকানে কী মতলবে গিয়েছিলে?'

সে চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'মতলব কিছু ছিল না। মাথার মধ্যে গুমোট জমে উঠেছিল, তাই একটু হাওয়া-বাতাস লাগাতে বেরিয়েছিলাম। দোকানে বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে মাঝে মাঝে প্রভাতের সঙ্গে আড্ডা দিতে দোকানে আসে।' চায়ে একটি চুমুক দিয়া সে সিগারেট ধরাইল, বলিল, 'বিকাশের সঙ্গে দেখা হল ভালই হল, তাকে কাল বিকেলে আসতে বলেছি।'

'তাকে তোমার কী দরকার?'

‘দরকার হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে সন্তোষবাবুর ওপর। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তিনি যদি আমায় বরখাস্ত করেন তাহলে আর কিছু করবার নেই।’ সে পর্যায়ক্রমে চা ও সিগারেটের প্রতি মনোনিবেশ করিল। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ভাসা-ভাসা উত্তর পাইলাম। তাহার স্বভাব জানি। তাই আর নিষ্ফল প্রশ্ন করিলাম না।

০৪. সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম

পরদিন ঠিক ন'টার সময় আমরা দুইজনে সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম। ক্লাইভ স্ট্রীটে প্রকাণ্ড সওদাগরী সৌধ, তাহার দ্বিতলে সন্তোষবাবুর অফিস।

সন্তোষবাবু সবেমাত্র অফিসে আসিয়াছেন, এত্তেলা পাইয়া আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপর কাগজপত্রের ফাইল, দু'টি টেলিফোন, সন্তোষবাবু টেবিলের সামনে একাকী বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার পরিধানে বিলাতি বেশ; কোট খুলিয়া রাখিয়াছেন; লিনেনের শার্টের সম্মুখভাগে দামী সিল্কের টাই শোভা পাইতেছে।

সন্তোষবাবু হাত নাড়িয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। আমরা টেবিলের পাশে উপবিষ্ট হইলে তিনি ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'কি খবর?

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনেছেন বোধহয়, পুলিস সাব্যস্ত করেছে হেনার মৃত্যু সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা।'

সন্তোষবাবু চকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! আমি শুনিনি।' তারপর আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল। মনে একটা অস্বস্তি লেগে ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আমি এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি।'

সন্তোষবাবু একটু বিস্ময়ের সহিত তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ও–মানে আপনার বিশ্বাস হেনাকে কেউ খুন করেছে?—কোন সূত্র পেয়েছেন কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রথমত, ঘরে আগুন লাগাটা স্বাভাবিক মনে হয় না।'

সন্তোষবাবু শূন্য পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তা বটে, ঘরে আগুন লাগাটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ তখন মাউথ-অগনিবাদকের কথা বলিল। সন্তোষবাবু গভীর মনোযোগের সহিত শুনিলেন, তারপর বলিলেন, 'হুঁ। কিন্তু আমি যতদূর জানি এখানে হেনার চেনা-পরিচিত কেউ নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাকিস্তানের লোক হতে পারে। হয়তো কাজের সূত্রে দশ-বারো দিন অন্তর কলকাতায় আসতো, আর হেনার সঙ্গে দেখা করে যেত।'

এই সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সন্তোষবাবু টেলিফোন কানে দিয়া শুনিলেন, দু'বার ই হু করিলেন, তারপর যন্ত্র রাখিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'হতে পারে-হতে পারে। তা, আপনি এখন কি করতে চান?

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার যদি অনুমতি থাকে, আমি একবার বাড়ির সকলকে জেরা করে দেখতে পারি।'

সন্তোষবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে আমি আমার পারিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু পুলিস যখন বলছে এটা দুর্ঘটনা, তখন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। অবশ্য, আপনার পারিতোষিক আপনি পাবেন–'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পারিতোষিকের জন্যে আমি ব্যগ্র নই মিস্টার সমাদার, এবং বেশি কাজ দেখিয়ে বেশি পারিতোষিক আদায় করার মতলবও আমার নেই। আমি শুধু সত্য আবিষ্কার করতে চাই।'

সন্তোষবাবু ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন, 'সত্য আবিষ্কার! পুলিসের হাঙ্গামা থেকে যখন রেহাই পেয়েছি, তখন নিছক সত্য আবিষ্কারে আমার আগ্রহ নেই-?

আবার টেলিফোন বাজিল। সন্তোষবাবু ফোনে কথা বলা শেষ করিতে না করিতে অন্য ফোনটা বাজিয়া উঠিল। একে একে দুইটি ফোনে কথা বলা শেষ করিয়া তিনি আমাদের পানে চাহিয়া হাসিলেন। ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কাজের সময় আপনাকে বিরক্ত করব না। তাহলে–আপনার আগ্রহ নেই?'

সন্তোষবাবু বলিলেন, 'আগ্রহ নেই, তেমনি আপত্তিও নেই। আপনি বাড়ির সকলকে জেরা করুন।'

‘ধন্যবাদ। রবিবর্মা কি অফিসে আছেন?’

‘না, তার শরীর খারাপ, সে আজ অফিসে আসেনি। বাড়িতেই আছে।’

‘আচ্ছা। আপনি দয়া করে বাড়িতে জানিয়ে দেবেন। আমরা যাচ্ছি।’

‘আচ্ছা।’ তিনি টেলিফোন তুলিয়া নম্বর ঘুরাইতে লাগিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্তোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম আন্দাজ সাড়ে ন’টার সময়। দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, ‘চল, আগে বাগানটা দেখে যাই।’

আমরা পূর্বদিকে মোড় ঘুরিলাম। বাড়ির কোণে হেনার ঘরের পোড়া কাঁচভাঙা জানালা দুটা গহ্বরের মত উন্মুক্ত হইয়া আছে। গোলাপের বাগানে সিলভার পাইনের ছায়া পড়িয়াছে, অজস্র শ্বেত-রক্ত-পীত ফুল ফুটিয়া আছে। এদিকে ভারা নাই, চুনকাম-করা দেয়াল রৌদ্র প্রতিফলিত করিতেছে। হেনা এই দেয়ালের পদমূলে পড়িয়া মরিয়াছিল, কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নাই। হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি, কিন্তু চিহ্ন থাকে না।

বাড়ির পিছন দিকে ভারা লাগানো আছে। মিস্ত্রিরা মেরামতের কাজ আরম্ভ করিয়াছে, দুইজন মজুর মাথায় লোহার কড়া লইয়া ভারা-সংলগ্ন মই দিয়া ওঠা-নামা করিতেছে। মন্থরভাবে কাজ চলিতেছে।

পিছন দিক বেড়িয়া আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকে উপস্থিত হইলাম। এখানেও দেয়ালের গায়ে ভারা লাগানো, মিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে, মজুর ওঠা-নমা করিতেছে। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দেখিল, তারপর মই বাহিয়া তরুতর করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

তিনতলার আলিসার উপর দিয়া একবার ছাদে উঁকি মারিয়া সে আবার নামিয়া আসিল। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার। ছাদে কী দেখলে?'

সে হাসিয়া বলিল, 'ছাদে দর্শনীয় কিছু নেই। দর্শনীয় বস্তু ঐখানে।' বলিয়া বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, খিড়কির ফটক। ব্যোমকেশ সেই দিকে অগ্রসর হইল, আমি চলিলাম। বাগানের এই দিকটাতে আম-লিচু-পেয়ারা-জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছ; আমরা এই ফলের বাগান পার হইয়া বাড়ির বহিঃপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম।

খিড়কির ফটকটি সঙ্কীর্ণ লোহার শিক-যুক্ত কপট আন্দাজ পাঁচ ফুট উঁচু। তাঁহাতে তালা লাগাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও মরিচা-ধরা অবস্থা দেখিয়া মনে হয়। বহুকাল তালা লাগানো

হয় নাই। ফটকের বাহিরে একটি সরু গলি গিয়াছে। এই পথ দিয়া বাড়ির চাকর-বাকর যাতায়াত করে।

ব্যোমকেশ আমার দিকে ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, 'কি বুঝলে?'

বলিলাম, 'এই বুঝলাম যে, বাইরে থেকে অলক্ষিতে বাগানে প্রবেশ করা যায় এবং বাগান থেকে মই বেয়ে ছাদে উঠে যাওয়াও শক্ত নয়।'

সে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'শাবাশ।-চল, এবার বাড়ির মধ্যে যাওয়া যাক।'

হল-ঘরে নেংটি হেনরি পোড়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া আগাইয়া আসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কি দেখছিলে?'

নেংটি বলিল, 'কিছু না। আজ সকালে মাসিম এসে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছেন। কাল থেকে মিস্ত্রি লাগবে। নতুন দোর-জানোলা বসানো হবে, ঘরের প্ল্যাস্টার তুলে ফেলে নতুন করে প্ল্যাস্টার লাগানো হবে। ভাগ্যিস আগাগোড়া কংক্রিটের বাড়ি, নইলে সারা বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সেই সঙ্গে আমরাও।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। বাড়ির সব কোথায়?'

নেংটি বলিল, 'বাড়িতেই আছে, মেসোমশাই ফোন করেছিলেন। দাদারা কলেজে যায়নি। ডেকে আনিব?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আমি প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে দেখা করব। রবিবর্মা কোথায়?'

'নিজের ঘরে।' বলিয়া নেংটি আঙুল দেখাইল।

'আচ্ছা। তুমি তাহলে দোতলায় গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও। আমি রবিবর্মার সঙ্গে দেখা করেই যাচ্ছি।'

নেংটি দ্বিতলে চলিয়া গেল, আমরা রবিবর্মার দ্বারের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইলাম। দ্বার ভেজানো ছিল, ব্যোমকেশ টোকা দিতেই খুলিয়া গেল। রবিবর্মা বলিল, 'আসুন।' তাহার গায়ে ধূসর। রঙের আলোয়ান জড়ানো, শীর্ণ মুখ আরও শুষ্ক দেখাইতেছে—'শরীরটা ভাল নেই, তাই অফিস যাইনি।' বলিয়া কাশি চাপিবার চেষ্টা করিল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি আয়তনে হেনার ঘরের সমতুল্য। আসবাবও অনুরূপ; একহারা খাট, টেবিল, চেয়ার, বইয়ের শেলফ। ঘরটি রবিবর্মা বেশ পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

ব্যোমকেশ রব্বিমাকে কিছুক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'রবিবাবু, তুমুপনি সত্যিই সন্তোষবাবুর নিভৃত কুঞ্জের ফোন নম্বর জানেন না?'

রবিবর্মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, সত্যি জানি না। কর্তা আমাকে জানাননি, তাই আমিও জানিবার চেষ্টা করিনি। আমি মাইনের চাকর, আমার কি দরকার বলুন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। সুকুমারীর নিজের বাসার ফোন নম্বর তো আপনার জানা আছে, সেখানেও হেনার মৃত্যুর খবর দেননি?

'আজ্ঞে না।'

'সে-সময় অন্য কাউকে ফোন করতে দেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে-গোলমালের মধ্যে সব দিকে নজর ছিল না। মনে হচ্ছে পুলিস আসবার পর নেংটি কাউকে ফোন করেছিল।'

'নেংটি আমাকে ফোন করেছিল। সে যাক। —বলুন দেখি, পরশু রাত্রে যখন হেনীর ঘরে আগুন লেগেছিল, আপনি কিছুই জানতে পারেননি?'

রবিবর্মা কাশিতে লাগিল, তারপর কাশি সংবরণ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে না, আমি জানতে পারিনি।'

'আশ্চর্য।'

'আজ্ঞে আশ্চর্য নয়, আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। আমার মাঝে মাঝে অনিদ্রা হয়, সারা রাত জেগে থাকি। শনিবার ওই সব ব্যাপারের পর ভাবলাম ঘুম আসবে না। তাই শোবার সময় আসপিরিনের বড়ি খেয়েছিলাম। তারপর রাত্রে কী হয়েছে কিছু জানতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক চাহিল। টেবিলের উপর একটা শিশি রাখা ছিল, তুলিয়া দেখিল- অ্যাসপিরিনের শিশি; প্রায় ভরা অবস্থায় আছে। শিশি রাখিয়া দিয়া সে একথোলো চাবি তুলিয়া লইল। অনেকগুলি চাবি একটি রিংয়ে গ্রথিত, ওজনে ভারী। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এগুলো কোথাকার চাবি?'

'অফিসের চাবি।' রবিবর্মা চাবির গোছা ব্যোমকেশের হাত হইতে লইয়া নিজের পকেটে রাখিল–'অফিসের বেশির ভাগ দেরাজ-আলমারির চাবি আমার কাছে থাকে।'

ব্যোমকেশ সহসা প্রশ্ন করিল, 'রবিবাবু, আপনার দেশ কোথায়?'

থতমত খাইয়া রবিবর্মা বলিল, 'দেশ? কুমিল্লা জেলায়।'

'হেনাকে আগে থাকতে চিনতেন?'

রবিবর্মার তির্যক চোখে শঙ্কার ছায়া পড়িল, সে কাশির উপক্রম দমন করিয়া বলিল, ‘আজ্ঞে না।’

‘তার বাপ কমল মল্লিককে চিনতেন না?’

‘অ্যাঞ্জে না।’

‘হেনার মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?’ রবিবর্মা একটু ইতস্তত করিল, গলা বাড়াইয়া একবার হল-ঘরের দিকে উঁকি মারিল, তারপর চুপিচুপি বলিল, ‘কাউকে বলবেন না, একটা কথা আমি জানি।’

‘কি জানেন বলুন?’

‘সেদিন হেনার ঘরে দেখেছিলাম হেনা উলের জামা বুনছিল। কার জন্যে জামা বুনছিল জানেন? উদায়ের জন্যে।’

‘উদয়ের জন্যে! আপনি কি করে জানলেন?’

‘একদিন বিকেলবেলা আমি দেখে ফেলেছিলাম। উদয় এক বাণ্ডিল উল এনে হেনাকে দিচ্ছে। হেনা সেই উল দিয়ে সোয়েটার তৈরি করছিল।’

'উদয়ের সঙ্গে তাহলে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল?' রবিবর্মা সশঙ্ক চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আর যুগলের সঙ্গে?'

'আমি জানি না। ব্যোমকেশবাবু, আমি যে আপনাকে কিছু বলেছি, তা যেন আর কেউ জানতে না পারে। বৌদি জানতে পারলে—'

বৌদি, অর্থাৎ, শ্রীমতী চামেলি। সকলেই তাঁহার ভয়ে আড়ষ্ট। মনে পড়িল, সে-রাত্রে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় তাঁহার চাপা কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, তুমি চুপ করে থাকবে, কোন কথা বলবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল না?'

রবিবর্মা চমকিয়া উঠিল, 'আমার সঙ্গে–আমি সারা জীবন মেয়েলোককে এড়িয়ে চলেছি। ওসব রোগ আমার নেই, ব্যোমকেশবাবু।'

'ভাল। চল অজিত, ওপরে যাওয়া যাক।।'

দোতলায় যুগলের ঘরের উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে গিয়া একটি নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া ফেলিলাম। যুগল টেবিলের সামনে বসিয়া আছে, হাতে কলম, সম্মুখে খাতা, চিংড়ি চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে ফিসফিস করিয়া কি

বলিতেছে। আমাদের দেখিয়া সে ত্রস্তা হরিণীর মত চাহিল, তারপর আমাদের পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যুগল ঈষৎ লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আসুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে দুতিনটে প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেব, তারপর আপনি যদি কলেজে যেতে চান যেতে পারেন।'

যুগল ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'দেরি হয়ে গেছে, সকালের দিকেই ক্লাস ছিল।' সে টেবিলের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া খাটের পাশে বসিল, 'কি জানতে চান বলুন? তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে ধীর নম্রতা প্রকাশ পাইল। সে-রক্রির সেই বাজাহত বিভ্রান্তির ভাব আর নাই।

ব্যোমকেশ তাহারপাশে বসিয়া বলিল, 'আপনি কবিতা লেখেন?'

যুগল অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ক্ষীণস্বরে বলিল, 'মাঝে মাঝে লিখি।'

ব্যোমকেশ পকেট হইতে এক টুকরা গোলাপী কাগজ লইয়া যুগলের সম্মুখে ধরিল, বলিল, 'দেখুন তো, এটা কি আপনার লেখা?

দেখিলাম যুগলের সুশ্রী মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছে। সে কাগজের টুকরা লইয়া সংশয়িত চিত্তে নাড়াচাড়া করিতেছে, আমি ইত্যবসরে টেবিলের উপর হইতে খাতা লইয়া চোখ বুলাইলাম। কবিতার খাতা, তাহাতে চতুষ্পদী জাতীয় কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা লেখা রহিয়াছে। সবগুলিই অনুরাগের কবিতা, তার মধ্যে একটি মন্দ লাগিল না–

গোলাপ, তোমারে ধরিনু বুকের মাঝে
বিনিময়ে তুমি কাঁটায় ছিড়িলে বুক
রক্ত আমার দরদর ঝরিয়াছে
সেই শোণিমায় রাঙা করে নাও মুখ।

এখানে গোলাপ কে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

ওদিকে যুগল দু'বার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমারই লেখা।'

ব্যোমকেশ কণ্ঠস্বরে সমবেদনা ভরিয়া বলিল, 'হেনার সঙ্গে আপনার ভালবাসা হয়েছিল।'

যুগল কিয়াৎকোল নতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভালবাসা-কি জানি। হেন যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একটা নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল–তারপর এখন—'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লস্বরে বলিল, 'নেশা কেটে যাচ্ছে। বেশ বেশ। জানালা দিয়ে গোলাপফুল আপনিই ফেলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'হেনা তখন ঘরে ছিল না?'

'না।'

'যুগলবাবু, সে-রত্রে আপনার ভাই উদয়বাবু অভিযোগ করেছিলেন যে, আপনি হেনাকে মেরেছেন। এ অভিযোগের কারণ কি?'

যুগল ধীরে ধীরে বলিল, 'কারণ-ঈর্ষা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে উদয়বাবুও কোর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

সেই অতি পুরাতন নিশুম্ভ ও মোহিনীর কাহিনী। ভাগ্যক্রমে কাহিনীর উপসংহার ভিন্নপ্রকার দাঁড়াইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের দু'জনের মধ্যে হেনা কাকে বেশি পছন্দ করত?'

যুগল ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, 'এখন মনে হচ্ছে হেনা কাউকেই পছন্দ করত না।'

'আপনারা দুভাই ছাড়া আর কেউ হেনার প্রতি আসক্ত হয়েছিল? যেমন ধরুন—রবিবর্মা?'

যুগল চকিতে মুখ তুলিল। তাহার মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিল, 'রবিবর্মা! কি জানি, বলতে পারি না।'

উদয় নিজের ঘরে বসিয়া টেনিস র‍্যাকেটের তাঁতে তেল লাগাইতেছিল, আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই সে ঘন ভুরুর নীচে রূঢ় চক্ষু রাঙাইয়া বলিল, 'আবার কি চাই?'

ব্যোমকেশের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে তর্জনী তুলিয়া বলিল, 'তুমি হেনাকে উল এনে দিয়েছিলে তোমার সোয়েটার বুনে দেবার জন্যে।'

উদয় উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমাণ হয় তোমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেদিন সে যখন ছাদে গেল, তখন তুমিও তার পিছন পিছন ছাদে গিয়েছিলে। সেখানে তার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়, তুমি তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে।'

উদয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না-না! আমি ছাদে যাইনি। আমি হেনার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ছাদে পৌঁছুবার আগেই হেনা দোরে শিকল তুলে দিয়েছিল। আমি-আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিইনি-আমি তাকে ভালবাসতাম, সেও আমাকে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ নিষ্ঠুরস্বরে বলিল, 'হেনা আর যাকেই ভালবাসুক, তোমাকে ভালবাসতো না। সে তোমাকে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছিল। এস অজিত।'

আমরা হল-ঘরের মধ্যস্থিত গোল টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম , উদয় ক্ষণকাল আচ্ছল্লের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সামনে ফিরিয়া দেখি পিছনের সারির একটি ঘর হইতে শ্রীমতী চামেলি বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি বোধ হয়। সদ্য স্নান করিয়াছেন, ভিজা চুলের প্রান্ত হইতে এখনো জল ঝরিয়া পড়িতেছে, শাড়ির আচলটা কোনমতে মাথাকে আবৃত করিয়াছে, চোখে সন্দিগ্ধ উদ্বেগ। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

শ্রীমতী চামেলি তীব্র অনুচ্চস্বরে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'কী বলছিল উদয় আপনাকে?' ব্যোমকেশ বলিল, 'মারাত্মক কিছু বলেনি, আপনি ভয় পাবেন না। বসুন, আপনার কাছে দু-একটা কথা জানিবার আছে।'

শ্রীমতী চামেলি বসিলেন না, চেয়ারে বসিলে বোধ করি দেহ অশুচি হইয়া যাইবে। অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনারা কেন আমাদের উত্ত্যক্ত করছেন। আপনারাই জানেন। কি জানতে চান বলুন?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্নালাপ হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আপনি আগে সন্ত্রাসবাদীদের দলে ছিলেন?'

শ্রীমতী চামেলি বলিলেন, 'হ্যাঁ, ছিলাম।'

প্রশ্ন : আপনি অহিংসায় বিশ্বাস করেন না?

উত্তর: না, করি না।

প্রশ্ন : বর্তমানে স্বামীর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই?

উত্তর : সে-কথা সবাই জানে।

প্রশ্ন : অসদ্ভাবের কারণ কি?

উত্তর: যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রশ্ন: আপনার সন্দেহ-হেনা আপনার স্বামীর উপপত্নী ছিল?

উত্তর : হ্যাঁ। আমার স্বামীর চরিত্র ভাল নয়।

এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় ব্যোমকেশ যেন ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। শেষে অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল, 'নেংটি এবং চিংড়ি আপনার নিজের বোনপো বোনঝি?'

শ্রীমতী চামেলি একটু থমকিয়া গেলেন, তাঁহার উত্তরের উগ্রতাও একটু কমিল। তিনি বলিলেন, 'না, ওদের মা আমার ছেলেবেলার সখী ছিল, তার সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছিলুম। রক্তের সম্পর্ক নেই।'

প্রশ্ন: ওরা জানে?

উত্তর: না, এখনো বলিনি। সময় হলে বলব।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ। আর আপনাকে উত্ত্যক্ত করব না। চললাম।'

শ্রীমন্ত্র চামেলি তীব্রটিতে আমাদের পানে চাহিয়া রছিলেন, আমরা নীচের তলায় নামিয়া নেংটি ফটক পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিল। ব্যোমকেশের পানে রহস্যময় কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'কিছু বুঝতে পারলেন?'

ব্যোমকেশ একটু বিরক্তস্বরে বলিল, 'না। তুমি বুঝতে পেরেছ নাকি?'

নেংটি বলিল, 'আমার বোঝার কী দরকার। আপনি সত্যান্বেষী, আপনি বুঝবেন।'

ফুটপাথে আসিয়া ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিল–'সাড়ে দশটা। চল, এখনো সময় আছে, শ্রীমতী সুকুমারীকে দর্শন করে যাওয়া যাক।'

০৫. শ্রীমতী সুকুমারীর বাসা

শ্রীমতী সুকুমারীর বাসা মধ্য কলিকাতার ভদ্রপল্লীতে, আমাদের বাসা হইতে বেশি দূর নয়। বাড়ির নীচের তলায় দোকানপাট, দ্বিতলে শ্রীমতী সুকুমারীর বাসস্থান।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মৃদঙ্গ ও খঞ্জনির মৃদু নিক্কণ শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে তরল বিগলিত কণ্ঠস্বর-রাধেশ্যাম, জয় রাধেশ্যাম! এটা বোধহয় সুকুমারী বৈষ্ণবীর গলা-সাধার সময়।

কড়া নাড়ার উত্তরে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। থান-পরা গোলগাল চেহারা, চোখে স্টীলের চশমা, মুখখানি জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক। অনুমান করিলাম-সুকুমারীর 'মাসি' এবং 'বিজনেস ম্যানেজার'।

একটি ক্ষুদ্র ঘরে আমাদের বসাইয়া মাসি ভিতরে গেল। আমরা জাজিমপাতা তক্তপোশের কিনারায় বসিলাম। ঘরে অন্য আসবাব নাই, কেবল দেয়ালে গৌর-নিতাইয়ের একটি যুগ্মচিত্র বুলিতেছে।

ভিতরের ঘরে যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হইল। মাসি আসিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল। এটি বেশ বড় ঘর, মেঝেয় কাপেট পাতা। একজন শীর্ণকায় কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব মৃদঙ্গ কোলে লইয়া যামিনী রায়ের ছবির ন্যায় বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া কঠোর চক্ষে চাহিলেন,

তারপর উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অদূরে সুকুমারী খঞ্জনি হাতে বসিয়া ছিল, নতশিরে আমাদের প্রণাম করিয়া ললিতকণ্ঠে বলিল, 'আসুন।'

এক একজন মানুষ আছে যাহাদের যৌবনকাল অতীত হইলেও যৌবনের কুহক থাকিয়া যায়। সুকুমারীর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কম নয়, কিন্তু ওই যে ইংরেজিতে যাহাকে যৌন-আবেদন বলে তাহা এখনো তাহার সবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যামান; সাদা কথায়, তাহাকে দেখিলে পুরুষের মন অশ্লীল হইয়া ওঠে। উন্নত দীঘল দেহ, মুখখানিতে স্নিগ্ধ সরলতা মাখানো, চোখ দু'টি ঈষৎ ঢুলঢুলে। ছলাকলার কোন চেষ্টা নাই, অকপট সহজতাই যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিবিড় মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া প্রত্যয় হয়, কেবল সুকণ্ঠের জন্যই সে বিখ্যাত কীর্তন-গায়িকা হয় নাই, রূপ-গুণ-চরিত্র মিশিয়া যে সত্তাটি সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই বিদগ্ধজনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে; সে যেন মহাজন কবিদের কল্প লোকবাসিনী চিরায়মানা বৈষ্ণবী।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সন্তোষবাবু আপনার ঠিকানা দিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম—'

সুকুমারী ব্যোমকেশের মুখের উপর মোহভরা চক্ষু রাখিয়া বলিল, উনি আপনার কথা ফোনে জানিয়েছেন।' শুধু গানের গলা নয়, তাহার কথা বলার কণ্ঠস্বরও মধুক্ষরা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে হেনার কথা শুনেছেন?'

সুকুমারী একটু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

‘হেনা নামে একটি মেয়েকে সন্তোষবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, একথা আপনি আগে থেকেই জানতেন?’

‘হ্যাঁ। বাপ-মা হারা বন্ধুর মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আমি জানতাম।’

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, ‘দেখুন, আপনার সঙ্গে সন্তোষবাবুর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতার কথা আমি জানি, সুতরাং আমার কাছে সঙ্কোচ করবেন না। সেদিন—অর্থাৎ শনিবার দুপুরবেলা থেকে কি কি হয়েছিল আমায় বলুন।’

সুকুমারী কিছুক্ষণ নতমুখে পায়ের নখ খুঁটিয়া বলিল, ‘আমার মনে কোন সঙ্কোচ নেই, বরং গৌরব। কিন্তু ওঁর মান ইজ্জত আছে, তাই লুকিয়ে রাখতে হয়। সেদিনের কথা শুনতে চান বলছি। ও বাড়িটাকে আমরা ছোট বাড়ি বলি। সেদিন বেলা আন্দাজ দুটোর সময় এখানকার কাজকর্ম সেরে আমি ছোট বাড়িতে গেলুম। পাঁচ দিন বাড়ি বন্ধ থাকে, ঝাড়া মোছা করতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। তারপর উনি এলেন।

‘এসে অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান করলেন। ছোট বাড়িতে ওঁর পাঁচ সেট জামা-কাপড় আছে, অনেক ইংরেজি বই আছে। উনি নিজের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসলেন, আমি জলখাবার তৈরি করতে গেলুম। বাজারের খাবার উনি খান না।

‘ছটার সময় উনি জলখাবার খেলেন। তুতারপর গান শুনতে বসলেন। ছোট বাড়িতে সঙ্গীতের যন্ত্র কিছু নেই, আমি কেবল খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাই। মনে আছে, সেদিন তিনটে পদ গেয়েছিলাম। একটি চণ্ডীদাসের, একটি গোবিন্দদাসের, আর একটি জগদানন্দর।

‘একটি পদ গাইতে অন্তত আধা ঘন্টা সময় লাগে। আমি জগদানন্দর ‘মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ’ পদটি শেষ করে এনেছি, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। আমি উঠবার আগেই উনি গিয়ে ফোন ধরলেন। দুমিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, ‘আমি এখনি যাচ্ছি, হেনা ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে।’

‘তিনি যে-বেশে ছিলেন সেই বেশে বেরিয়ে গেলেন।’

সুকুমারী নীরব হইলে ব্যোমকেশও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, ‘কে টেলিফোন করেছিল। আপনি জানেন না?’

সুকুমারী বলিল, ‘না। তারপর আমি এ-বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলাম, কিন্তু এ-বাড়ি থেকে কেউ ফোন করেনি।’

‘এ-বাড়িতে কে কে ফোন নম্বর জানে?’

‘কেবল দিদিমণি জানেন, আর কেউ না।’

‘দিদিমণি?

‘আমার অভিভাবিকা, কাজকর্ম দেখেন। তাঁকে ডাকব?’

‘ডাকুন।’

যাহাকে মাসি ভাবিয়ছিলাম। তিনিই দিদিমণি; আজকাল বোধহয় উপাধির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুকুমারীর বাক্য সমর্থন করিলেন। সেদিন তিনি টেলিফোন করেন নাই, এ-বাড়িতে তিনি ও সুকুমারী ছাড়া ছোট বাড়ির টেলিফোন নম্বর আর কেহ জানে না।

দিদিমণি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, ‘আপনার সকালবেলাটা নষ্ট হল।‘

সুকুমারী হাত জোড় করিয়া বলিল, ‘যদি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, একটা গান শুনে যান। আমার তো আর কিছুই নেই।’

সাদা গলায় কেবল খঞ্জনি বাজাইয়া সুকুমারী গান করিল। বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন-মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।

তাহার গান পূর্বে কখনো শুনি নাই, শুনিয়া বিভোর হইয়া গেলাম। কণ্ঠের মাধুর্যে উচ্চারণের বিশুদ্ধতায়, অনুভবের সুগভীর ব্যঞ্জনায় আমার মনটাকে সে যেন কোন দুর্লভ আনন্দঘন রসলোকে উপনীত করিল। এতক্ষণ তাহার চিত্তচাঞ্চল্যকর কুহকিনী মূর্তিই দেখিয়ছিলাম, এখন তাহার শুদ্ধশান্ত তদগত তাপসী রূপ দেখিলাম।

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া আমি বাহিরের ঘরে আসিয়াছি, ব্যোমকেশ তখনো আচাইতেছে, টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ফোন তুলিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে প্রবল বাক্যস্রোত বাহির হইয়া আসিল–'হ্যালো, ব্যোমকেশবাবু, আমি চামেলি সমাদ্দার। দেখুন, আপনি সন্দেহ করেন আমার ছেলেরা হেনাকে খুন করেছে। ভুল-ভুল। আমার ছেলেরা বাপের মত নয়, ওরা সচ্চরিত্র ভাল ছেলে। ওরা কেন হেনাকে খুন করতে যাবে? আমি বলছি আপনাকে, কেউ হেনাকে খুন করেনি, সে নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে। নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখছিল, তাল সামলাতে পারেনি।'

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি দম লইবার জন্য থামিলেন, আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'দেখুন, আমি ব্যোমকেশ নই, অজিত। ব্যোমকেশকে ডেকে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ হতচকিত নীরবতা, তারপর কটু করিয়া টেলিফোন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ব্যোমকেশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে শ্রীমতী চামেলির কথা বলিলাম। সে সিগারেট ধরাইয়া পায়চারি করিতে করিতে বলিল–'মহিলাটির প্রকৃতি স্নায়ুপ্রধান। আজ আমি। তাঁর ছেলেদের যে-সব প্রশ্ন করেছি তা বোধহয় জানতে পেরেছেন, তাই ভয় হয়েছে। পুলিস যে হাত গুটিয়েছে তা জানেন না, জানলে আমাকে ফোন করতেন না।' আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, আজ তো সকলকেই নেড়েচেড়ে দেখলে। কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে?'

সে হাত তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আরো ভাবতে দাও।'

অপরাহ্নে বিকাশ আসিল, সঙ্গে একটি ক্ষীণকায় যুবক। বিকাশের চেহারা বা বাকভঙ্গীতে কোনো পরিবর্তন নাই; সে যুবকের দিকে তর্জনি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এর নাম গুপীকেষ্ট, আমার শাকরেদ। যদি দরকার হয় তাই সঙ্গে এনেছি স্যার।'

এমন লোক আছে যাহাকে একবার দেখিয়া ভোলা যায় না। গুপীকেষ্ট ঠিক তাহার বিপরীত, তাহার চেহারা এতাই বৈশিষ্ট্যহীন যে হাজার বার দেখিলেও মনে থাকে না, বহুরূপী গিরগিটির মত বাতাবরণের সঙ্গে বেবাক মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

ব্যোমকেশ গুপীকেষ্টকে পরিদর্শন করিয়া সহাস্যে বলিল, 'বেশ বেশ, বোসো তোমরা। দু'জনকেই দরকার হবে। আরো দু'জন পেলে ভাল হত।'

বিকাশ সোৎসাহে বলিল, 'আরো আছে স্যার। কয়েকটা ছেলেকে টিকটিকি-তালিম দিচ্ছি। যদি পিছনে লাগার কাজ হয়, তারা পারবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, পিছনে লাগার কাজ। চারজন লোকের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'ব্যস, ঠিক আছে। বাবুই আর চিচিংকে লাগিয়ে দেব। ছেলেমানুষ হলেও ওরা হাঁশিয়ার আছে।' বিকাশ ও গুপীকেষ্ট তক্তপোশের প্রান্তে বসিল, বিকাশ বলিল, 'এবার সব কথা বলুন স্যার।'

ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে ডাকিয় চা-জলখাবার হুকুম করিল। তারপর মোটামুটি পরিস্থিতি বিকাশকে বুঝাইয়া দিল; চারজন লোকের উপর নজর রাখিতে হইবে; সন্তোষবাবু, রবিবর্মা, যুগল এবং উদয়। তাহারা কোথায় যায়, কাহার সহিত কথা বলে, অগতানুগতিক কিছু করে কিনা। রোজ ব্যোমকেশকে রিপোর্ট দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু কোনো বিষয়ে খাটুকা লাগিলে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট দিতে হইবে।

কাজকর্ম বুঝাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল থেকে কাজ শুরু করে দাও। আজ লোকগুলোকে তোমাদের চিনিয়ে দেব। সন্তোষবাবুর অফিস থেকে ফেরার সময় হল। চা খেয়ে নাও, তারপর আমি তোমাদের নিয়ে বেরুব।' বিকাশ বলিল, 'আপনার যাবার কিছু দরকার নেই স্যার। সন্তোষবাবুর ঠিকানা দিন, আমরা সবাইকে চিনে নেব।'

ব্যোমকেশ ঠিকানা দিল। বিকাশ বলিল, 'এখন বলুন স্যার, কে কার পিছনে লাগবে। আমি কার পিছনে লাগব? সন্তোষবাবু?'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'না, তুমি লাগবে রবিবর্মার পিছনে। আর গুপীকেষ্ট লাগবে সন্তোষবাবুর পিছনে। বাকি দু'জন যেমন তেমন হলেই হল।'

'তাই হবে স্যার।' তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া বিকাশ ও গুপীকেষ্ট চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'সন্তোষবাবুকেও তাহলে তুমি সন্দেহ করা?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি সকলকেই সন্দেহ করি। তুমি যদি সেদিন ওখানে উপস্থিত থাকতে, তাহলে তোমাকেও সন্দেহ করতাম।'

প্রশ্ন করলাম, 'নেংটিকে সন্দেহ কর?'

সে বলিল, 'নেংটি যদি আমাকে খবর না দিত তাহলে তাকেও সন্দেহ করতাম।'

'আর চিংড়িকে?

'চিংড়িকে সন্দেহ করি। বোধহয় লক্ষ্য করেছ, বয়সে ছেলেমানুষ হলেও সে যুগলকে ভালবাসে। হেনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, সুতরাং তার মোটিভ আছে। সুযোগও প্রচুর।'

'কোথায় সুযোগ? যদি উদয়ের কথা বিশ্বাস করা যায়, হেনা ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'চিংড়ি আগে থাকতে ছাদে গিয়ে লুকিয়েছিল। কিনা কে জানে। এ যুক্তি শ্রীমতী চামেলির বেলাতেও খাটে। তিনি হেনাকে সহ্য করতে পারতেন না, তিনি মনে করতেন হেনার সঙ্গে তাঁর স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক আছে।'

ব্যোমকেশের কথাগুলো কিছুক্ষণ মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি এই কেস সম্বন্ধে কী বুঝেছি আমায় বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটি কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি—এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন। এখন প্রশ্ন্ , কে খুন করেছে? একে একে সন্দেহভাজন লোকগুলিকে ধর। প্রথমে ধর সন্তোষবাবু। তিনি মস্ত বড় মানুষ, নামজাদা রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু তাঁর একটি দুর্বলতা আছে। মৃত বন্ধুর অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে তিনি আশ্রয় দিলেন। তাঁর এই সৎকার্যটি সম্পূর্ণ নিঃস্বর্থ দয়াদাক্ষিণ্য না হতে পুঞ্জ, কিন্তু তিনি হেনাকে খুন করবেন কেন? সুন্ন করার কোন মোটিভ নেই থাকলেও আমরা জানি না।'

বলিলাম, 'সুকুমারীর ব্যাপার নিয়ে হেনা তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিল এমন হতে পারে না কি?'

'হেনা পাকিস্তানের মেয়ে, সুকুমারী-ঘটিত ব্যাপার তার জানার কথা নয়। তবু মনে কর সে জানত। তাহলে সন্তোষবাবু তাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলেন কেন? আর ব্ল্যাকমেলে তাঁর ভয়ই বা কিসের! তাঁর স্ত্রী জানেন তাঁর চরিত্র ভাল নয়, ছেলেরা জানে বাপ শনিবারে-রবিবারে বাড়ি আসে না। রবিবর্মা জানে নেংটি জানে, বাড়ির সবাই জানে, সুতরাং বাইরের লোকও জানে। কিন্তু কারুর কিছু বলবার সাহস নেই, কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারে না।–হেনাকে সন্তোষবাবু ভয় করবেন কেন?'

'তা বটে। তাছাড়া তাঁর অ্যালিবাই আছে।'

'শুধু তাঁর অ্যালিবাই নয়, সুকুমারীরও। দু'জনে দু'জনের অ্যালিবাই যোগাচ্ছেন। সুকুমারীকেও সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তার সুযোগ যত কমই হোক, মোটিভ যথেষ্ট ছিল। সন্তোষবাবুর কাছ থেকে সে হাজার টাকা মাইনে পায়, হয়তো কিছু ভালবাসাও আছে। হেনাকে যদি সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করে তাহলে হেনাকে খুন করার মোটিভ তার আছে।'

'তুমি সত্যিই সুকুমারীকে সন্দেহ কর?'

'সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, এ হচ্ছে হিসেবের কড়ি, একটি কানাকড়ি বাদ দেওয়া চলে না।'

'তারপর?'

'তারপর রবিবর্মা। তার সুযোগ ছিল প্রচুর, কিন্তু মোটিভ নিয়েই গণ্ডগোল। লোকটির প্রকৃতি পাঁকাল মাছের মত, ধরা-ছোঁয়া যায় না, ধরতে গেলেই পিছলে যায়। আমার মনে হয় রবিবর্মা আগে থেকে হেনাকে চিনত। হেনার প্রতি তার আকর্ষণ বিকর্ষণ দুইই ছিল। আকর্ষণ বুঝতে পারি, রবিবর্মা অবিবাহিত, হেনার মত সুন্দরী মেয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হবে এতে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু বিকর্ষণ কিসের জন্যে? হেনা কি তার কোন বিপজ্জনক গুপ্তকথা জানত? হেনা তাকে প্রণয়-ব্যাপারে প্রশ্বয় দেয়নি। তাই আক্রোশ? তাই কি সে উদয়কে ফাঁসাতে চায়?'

'উদয়কে ফাঁসিতে চায়?'

'উদয় হেনাকে উল কিনে দিয়েছিল, হেনা তার জন্যে সোয়েটার বুনছিল–একথা আমাকে বলবার দরকার ছিল না। এ থেকে মনে হয়, সে নিজের ঘাড় থেকে সন্দেহ নামিয়ে উদয়ের ঘাড়ে চাপাতে চায়।'

'হুঁ। তারপর?'

'তারপর উদয়। গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে, কড়া মেজাজ, কিন্তু হেনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। হেনা বোধহয় তাকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি আশকারা দিত, উদয় ভাবত হেনা তাকেই ভালবাসে। তারপর সে জানতে পারল যুগলের সঙ্গে হেনার কবিতা লেখালেখি চলছে, গোলাপফুলের আদান-প্রদান চলছে। ছাদের ওপর এই নিয়ে হেনার

সঙ্গে উদয়ের ঝগড়া হল, রাগের মাথায় উদয় হেনাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিল। হয়তো তার খুন করবার ইচ্ছা ছিল না—'

বলিলাম, 'আর যুগল? তার কী মোটিভ ছিল?'

সে বলিল, 'একই মোটিভ-যৌন-ঈর্ষা। যুগল শান্তশিষ্ট কবি মানুষ, কিন্তু তার প্রাণের মধ্যে কি রকম দুবার আগুন জ্বলে উঠেছিল কে বলতে পারে। সে যদি জানতে পেরে থাকে যে, হেনা উদয়ের জন্যে পশমের জামা বুনছে—'

'কিন্তু সে ছাদে গেল কি করে? উদয় সিঁড়ি দিয়ে হেনার পিছু পিছু গিয়েছিল।'

'যুগল বাগানে গিয়েছিল, বাগান থেকে গোলাপফুল তুলে জানোলা দিয়ে হেনরি টেবিলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর ভারার মই বেয়ে ছাদে উঠে যাওয়া কি তার পক্ষে খুব শক্ত?'

'না, শক্ত নয়। কিন্তু গোলাপফুল উপহার দিয়েই তাকে খুন করল?'

'গোলাপফুলটা হয়তো ভাঁওতা, পুলিসের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।'

'বুঝলাম। আর কে বাকি রইল?'

‘শ্রীমতী চামেলি এবং চিংড়ি। দু’জনেরই মোটিভ আছে, দু’জনেরই সুযোগ সমান। শ্রীমতী চামেলি যখন বাথরুমে ছিলেন চিংড়ি তখন একলা ছিল, আবার চিংড়ি যখন বাথরুমে ছিল, শ্রীমতী চামেলি তখন একলা ছিলেন।’

আমি বলিলাম, ‘তাহলে দাঁড়াল কী? এই সাতজনের মধ্যে আসল দোষী কে?’

সে বলিল, ‘শুধু সাতজন নয়, আর একটি ছিপে রুস্তম আছেন যিনি মাউথ-অগনি বাজিয়ে হেনাকে ইশারা দিয়ে যেতেন।’

ঠিক তো, বংশীবদন বনমালীর কথা মনে ছিল না। প্রশ্ন করিলাম, ‘ব্যোমকেশ, ও লোকটা কে?’

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, ‘হিন্দু কি মুসলমান বলতে পারি না, কিন্তু পাকিস্তানী লোক সন্দেহ নেই। বোধহয় দু’জনের মধ্যে প্রণয় ছিল, লোকটা পাকিস্তান থেকে হেনাকে বই এনে দিত। প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে কখন কি ঘটে কিছুই বলা যায় না। প্রণয় হয়তো ক্রমশ বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হেনার মন উদয়ের দিকে ঢলেছিল।’

‘লোকটা দশ-বারো দিন অন্তর আসত কেন?’

‘হয়তো সে প্লেনে আসত, হয়তো সে প্লেনের একজন অফিসার; দশ-বারো দিন অন্তর দমদমে নামে, হেনার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে যায়। সবই অবশ্য অনুমান।’

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া পাশের ঘরে গেল, শুনিতে পাইলাম কাহাকে ফোন করিতেছে। দু-তিন মিনিট পরে ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে?'

সে বলিল, 'নেংটিকে। বংশীধারী লোকটি হেনার মৃত্যুর পর আর এসেছিল। কিনা খবর নিচ্ছিলাম। নেংটি বলল, আসেনি।'

'না আসার কি কারণ থাকতে পারে?' 'হয়তো হেনীর মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছে, কিংবা অসুখে পড়েছে, কিংবা মরে গেছে। কত রকম কারণ থাকতে পারে।' হঠাৎ ব্যোমকেশ স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। দেখিলাম সে আমার দিকে চাহিয়া আছে বটে। কিন্তু আমাকে দেখিতেছে না, মনশ্চক্ষু দিয়া অভাবনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। তারপর সে চাপা গলায় বলিল, 'অজিত।'

বলিলাম, 'কি হল?' সে বলিল, 'যেদিন হেনা মারা যায় সেদিনের কথা মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন? সে তো পরশু!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুপুরবেলা তুমি খবরের কাগজ পড়ে শোনালে। একটা পাকিস্তানী প্লেন বানচাল হয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবেছে, মনে আছে? আমি মৈনাক পর্বতের গল্প বললাম—'

'মনে আছে বৈকি?'

‘সেদিনকার খবরের কাগজটা খুঁজে বার করতে পার?’

‘পারি।‘

পুরানো খবরের কাগজগুলো একস্থানে জমা করা হইত, মাসের শেষে পুঁটিরাম সেগুলিকে বিক্রয় করিত। আমি সেদিনের কাগজটা খুঁজিয়া আনিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে সাগ্রহে কাগজের পাতা উল্টাইয়া বিমান-বিপর্যয়ের ব্বিরণ দেখিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কি দেখছ?’

সে কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, ‘ডাকোটা প্লেন। সিঙ্গাপুর থেকে কায়রো পর্যন্ত দৌড়। অফিসার সবাই মুসলমান, কেবল একজন পাইলট ইংরেজ। যাত্রিদলের মধ্যে সব জাতের লোক ছিল—‘

ধীরে ধীরে কাগজ মুড়িয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ শূন্যদৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

০৬. আমাদের কর্মচঞ্চলতা

অতঃপর আমাদের যে কর্মচঞ্চলতা আসিয়াছিল, তাহা যেন দমকা বাতাসের মত অকস্মাৎ শান্ত হইয়া গেল। দুদিন আর কোনো সাড়াশব্দ নাই। কেবল বিকাশ একবার টেলিফোন করিয়া জানাইল তাহারা শিকারের পিছনে লাগিয়া আছে। সন্তোষবাবু ও রবিবর্মা নিয়মিত অফিস যাইতেছেন ও বাড়ি ফিরিতেছেন; যুগল ও উদয় কলেজ যাইতেছে ও বাড়ি ফিরিতেছে; উদয় মাঝে একদিন বিকালবেলা হকি খেলিতে গিয়াছিল। উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো খবর নাই।

তৃতীয় দিন, অথাৎ, বৃহস্পতিবারে আবার আমাদের জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিল, তৈলাভাবে নিবন্ত প্রদীপ আবার ভাস্বর হইয়া উঠিল।

সকালবেলা নেংটি আসিল। তাহার ভাবভঙ্গীতে একটু অস্বস্তির লক্ষণ। ব্যোমকেশ তাহাকে একটি সিগারেট দিয়া বলিল, 'কি খবর?'

নেংটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, সিগারেট ধরাইয়া কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিল। তারপর বলিল, 'ব্যোমকেশদা, আপনি কি উদয়দার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছেন?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিল, 'কে বলল?'

'উদয়দা বলল, একটা সিড়িঙ্গে ছোড়া তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'উদয় বুঝি খুব ঘাবড়ে গেছে?'

'ঘাবড়াবার ছেলে উদয়ন্দা নয়, সে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে; যেন ভারি গৌরবের কথা। মাসিমা কিন্তু ভয় পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া চাহিল, 'তাই নাকি। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন কেন?'

নেংটি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা জানি না। কাল উদয়ন্দা মাসিমার কাছে বড়াই করছিল, জানো মা, আমার পিছনে পুলিস-গোয়েন্দা লেগেছে। তাই শুনে মাসিমার মুখ শুকিয়ে গেল। একেই তো ছটফট মানুষ, সেই থেকে আরো ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন। আজ সকালে আমাকে বললেন, তুই ব্যোমকেশবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলার।'

'আমার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ।–ব্যোমকেশদা, কিছু হদিস পেলেন?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কিছু হদিস পেয়েছি।'

নেংটি বিস্ফারিত চক্ষে বলিল, 'পেয়েছেন।'

‘বোধহয় পেয়েছি, কিন্তু তা এখনও বলবার মত নয়। চল, তোমার মাসিমা কি বলেন শুনে আসি। ওঠ অজিত।’

সন্তোষবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নীচের তলার হল-ঘরে হৈ-হুল্লোড় চলিতেছে। চিংড়ি একটা তালপাতার পাখা লইয়া যুগলকে মারিতে ছুটিয়াছে, উদয় চিংড়ির লম্বা বেণী ঘোড়ার রাশের মত ধরিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং বলিতেছে-‘হ্যাট ঘোড়া-হ্যাটু হ্যাট।’। চিংড়ি বলিতেছে, ‘কেন আমার খোঁপা খুলে দিলে?’ তিনজনেই উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে এবং ঘরময় ছুটাছুটি করিতেছে। তিনজনের মুখেই খুনসুড়ির উল্লাস।

আমাদের আবিভাবে রঙ্গক্রীড়া অর্ধপথে থামিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য তিনজনে অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চিংড়ি লজ্জিত মুখে সিঁড়ি দিয়া উপরে পলায়ন করিল; যুগল ও উদয় অপেক্ষাকৃত মন্থর পদে তাহার অনুবতী হইল।

নেংটি আমাদের বসাইয়া মাসিমাকে খবর দিতে গেল। আমি চুপি চুপি ব্যোমকেশকে বলিলাম, ‘ভায়ে ভায়ে ভাব হয়ে গেছে দেখেছি?’

ব্যোমকেশ একটু গভীর হাসিয়া বলিল, ‘এর নাম যৌবন।’

নেংটি নামিয়া আসিয়া বলিল, ‘মাসিমা আপনাদের ওপরে ডাকছেন।’

দ্বিতলে উঠিলাম, কিন্তু হল-ঘরে কেউ নাই। এই খানিক আগে যাহারা উপরে আসিয়াছিল, তাহারা বোধকরি স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। নেংটি একটি ভেজানো দোরের কপাটে টোকা মারিল। ভিতর হইতে আওয়াজ হইল, 'এস।'

নেংটি দ্বার ঠেলিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরটি শয়নকক্ষ হিসাবে বেশ বিস্তৃত; একপাশে জোড়া-খাট ঘরের বিস্তার খর্ব করিতে পারে নাই। খাটটিতে সম্ভবত শ্রীমতী চামেলি চিংড়িকে লইয়া শয়ন করেন। খাট ছাড়া ঘরে ওয়ার্ডরোব, কাপড়ের আলনা, ড্রেসিং-টেবিল, দুইটি আরাম-কেন্দারা। দেয়ালে একটি লেলিহরসনা মা-কালীর পট। দুইটি বড় বড় জানোলা দিয়া বাড়ির পিছন দিকের পাইনের সারি দেখা যাইতেছে।

ঘরে দুইটি স্ত্রীলোক। এক, শ্রীমতী চামেলি; তিনি স্নান করিয়া গরদের শাড়ি পরিয়াছেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিঁদুরের ফোঁটা, মুখ গভীর, চক্ষে চাপা উত্তেজনার অস্বাভাবিক দীপ্তি। দ্বিতীয়, চিংড়ি। তাহার ক্রীড়া-চপলতা আর নাই। সে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া আছে।

শ্রীমতী চামেলি বলিলেন, 'নেংটি, চিংড়ি, তোরা বাইরে যা, আমি এদের সঙ্গে কথা কইব।'

চিংড়ির যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে শম্বুকগতিতে জানালা হইতে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেছিল, নেংটি গভীর ভ্রূকুটি করিয়া মস্তক-সঞ্চালনে তাহাকে ইশারা করিল। দু'জনে ঘর হইতে বাহির হইল, নেংটি দ্বার ভেজাইয়া দিল।

শ্রীমতী চামেলি চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'আপনারা বসুন।' তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী কাটা-কাটা, যেন অত্যন্ত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বসুন।' ঘরে দু'টি মাত্র চেয়ার ছিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে বসিতে হইলে খাটের কিনারায় বসিতে হয়। শ্রীমতী চামেলি একবার খাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, 'আমি বসব না, আমার এখনো পুজো হয়নি। আপনারা বসুন।'

চেয়ারে বসিতে বসিতে ভাবিলাম, ইনি একদিন সন্ত্রাসবাদিনী ছিলেন, বন্দুক চালাইতেন; তখন নিশ্চয় শুচিবাই ছিল না। অবস্থাচক্রে মনের কত পরিবর্তনই না হয়।

আমরা উপবিষ্ট হইলে শ্রীমতী চামেলি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, ধীরে ধীরে গুনিয়া শুনিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। সংসারের সাধারণ কথা, যাহা ব্যোমকেশকে শুনাইবার কোনই সার্থকতা নাই; মনে হইল তিনি ভয় পাইয়াছেন, তাই আসল কথাটা বলিবার আগে খানিকটা ভণিতা করিয়া লইতেছেন।

কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনিয়া ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, বলিল, 'দেখুন, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি এ পরিবারের বন্ধু, সন্তোষবাবু আপনাদের সকলের স্বার্থরক্ষার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন। হেনার মৃত্যু-সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা থাকে, আমাকে খুলে বলতে পারেন।'

শ্রীমতী চামেলি একটু থমকিয়া গেলেন, ব্যোমকেশকে যেন নূতন চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনি পুলিসের দলের লোক নয়?

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, পুলিসের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু–কিন্তু–আপনি জানেন পুলিস আমার ছেলেদের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে।'

বুঝিলাম, শ্রীমতী চামেলি জানেন না যে পুলিস এ মামলা হইতে হাত গুটোইয়াছে। সন্তোষবাবুর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, কে-ই বা তাঁহাকে বলিবে।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী চামেলির স্বর তীব্র হইয়া উঠিল, 'এ কি অন্যায়; আমার ছেলেরা নির্দোষ। তবু তাদের পিছনে গুপ্তচর লাগবে কেন?'

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'তারা নির্দোষ কিনা জানতে চায় বলেই বোধহয় গুপ্তচর লেগেছে।'

'আমি হাজার বার বলেছি আমার ছেলেরা নির্দোষ, তবু তাদের বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু ওরা নির্দোষ তা আপনিই বা জানলেন কি করে? দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি ওদের মা, আপনার পক্ষে ওদের নিদোষিতায় বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে তো তা নয়। তাদের চোখে সবাই সমান।'

শ্রীমতী চামেলির চোখে আভ্যন্তরিক জল্পনার ছায়া পড়িল, তিনি এক পা সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ চাপা সুরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমি জানি হেনা কি করে মরেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

ব্যোমকেশ চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল—'স্বচক্ষে দেখেছেন।'

'হ্যাঁ!' শ্রীমতী চামেলি এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন, 'সেদিন চিংড়ি বাথরুমে যাবার পর আমি বাইরে এসে দেখলুম, হেনা তেতলার ছাদে যাচ্ছে। সকলেই জানে আমি হেনাকে সহ্য করতে পারি না, হেনাও আমাকে ভয় করে। আমি ভাবলুম, এই সুযোগে আমিও ছাদে গিয়ে যদি তাকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিই, তাহলে সে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আমার ছেলেরা নিরাপদ হবে।'

'তাহলে ছেলেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আপনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন? যাহোক, তারপর?'

‘আমিও সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ছাদে গেলুম। আমাকে দেখেই হেনা ভয় পেয়ে আলসের দিকে ছুটে গিয়ে আলসের গায়ে আছড়ে পড়ল। তারপর তাল সামলাতে না পেরে উলটে নীচে পড়ে গেল। আমাকে দেখে বোধহয় তার ভয় হয়েছিল যে আমি তাকে মারব।’

ব্যোমকেশ তাঁহার পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ‘এসব কথা আগে বলেননি কেন?’

শ্রীমতী চামেলি মুখের একটা অধীর ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ‘বললে কি কেউ বিশ্বাস করত? উল্টে সন্দেহ করত। আমিই হেনাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি।’

ব্যোমকেশ একবার ঘাড় হেঁট করিয়া আবার মুখ তুলিল, ‘তা বটে। আচ্ছা, আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গেলেন তখন উদয়কে দেখেছিলেন?’

শ্রীমতী চামেলি ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, ‘না, উদয় সেখানে ছিল না।’

‘কাউকে দেখেননি?’

না, কাউকে না।’

‘সিঁড়ির দরজা, ছাদে যাবার দরজা, নিশ্চয় খোলা ছিল?’

‘হ্যাঁ, খোলা ছিল।‘

‘আপনি যখন হেনাকে দেখলেন, তখন সে কী করছিল?’

‘ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।’

‘তার হাতে কিছু ছিল?’

‘লক্ষ্য করিনি।‘

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, ‘আর বোধহয় আপনার কিছু বলবার নেই। আচ্ছা, তাহলে আসি। পুলিসকে আপনার কথা বলে দেখতে পারেন।’

শ্রীমতী চামেলি শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাসায় ফিরিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল।

শ্রীমতী চামেলি ছেলেদের বাঁচাইবার জন্য যে নিপুণ কল্পকথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যোমকেশকে আরও বিভ্রান্ত ও বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। সে তক্তপোশের উপর লম্বা

হইয়া বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু হচ্ছে না-কিছু হচ্ছে না, শুধু ভাঁওতা, শুধু ধাপ্পা। সবাই আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছে।'

আমি বলিলাম, 'তোমারই বা কিসের গরজ, ব্যোমকেশ? পুলিস হাল ছেড়ে দিয়েছে, সন্তোষবাবুরও আগ্রহ নেই। তবে তুমি কেন মিছে খেটে মরছ!'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, 'মুশকিল কি হয়েছে জানো? আমি সত্যান্বেষী, সত্যি কথাটা যতক্ষণ না জানতে পারছি, আমার প্রাণে শান্তি নেই। দুক্তোর! এ সময়ে যদি অন্য একটা কাজ হাতে থাকতো তাহলে হয়তো ভুলে থাকতে পারতাম।–'

এই সময় সদর দরজার সামনে পোস্টম্যান আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্সিওর-করা রেজিস্ট্রি খাম। প্রেরকের নাম-উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের দপ্তর। কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম-কী ব্যাপার! ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া একটি টাইপ-করা চিঠি বাহির করিল।

প্রিয় মহাশয়, মান্যবর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের আদেশে এই পত্র লিখিতেছি। আপনি ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও বোম্বাই সরকারের পক্ষে যে কাজ করিয়াছেন তাহা আমাদের অবিদিত নহে।

সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকারের দপ্তরে কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দপ্তর হইতে মূল্যবান ও অতি গোপনীয় দলিল অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অপরাধীকে ধরা

যাইতেছে না। এ বিষয়ে উড়িষ্যা সরকার আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি অবিলম্বে কটিকে আসিয়া তদন্তের ভার গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। বিলম্বে রাষ্ট্রের ইষ্টহানির সম্ভাবনা।

আপনি কবে আসিতেছেন তার-যোগে জানাইলে উপকৃত হইব। আপনার রাহা-খরচ ইত্যাদি বাবদ ৫০০ টাকার চেক অত্রসহ পাঠানো হইল।

ধন্যবাদান্তে নিবেদন ইতি।–

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল মুখে চিঠি ও চেক আমার হাতে দিল, বলিল, 'সরকারী মহলে আমার খ্যাতি রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি।'

চিঠি পড়িয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে দুই হাত পিছন দিকে শৃঙ্খলিত করিয়া পায়চারি করিতেছে। বলিলাম, যা চাইছিলে তাই হল। যাবে তো?'

'দেশের কাজ। যাব বৈকি।'

'কবে যাবে?'

সে পদচারণে বিরতি দিয়া বলিল, 'অজিত, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এস। আর কটকে একটা তার করে দাও, আমরা অবিলম্বে যাচ্ছি।'

প্রশ্ন করিলাম, ‘অবিলম্বেটা কবে?’

সে হাসিয়া বলিল, ‘আজ কালের মধ্যে।’

০৭. সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময়

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় বিকাশ আসিল, বলিল, 'খবর আছে স্যার।'

বিকাশ, গুপীকেষ্ট, বাবুই ও চিচিং নামধারী চারিটি যুবক যে বোমকেশের পক্ষ হইতে টিকটিকির কাজ করিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনটা অগ্রবর্তী হইয়া কটকের দিকে ছুটিয়াছিল।

তিনজনে ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া তক্তপোশের উপর বসিলাম। বিকাশ বলিল, 'চীনেম্যানটা বড় জ্বালিয়াছে স্যার।'

'চীনে ম্যান!'

ওই যে আপনার রবিবর্মা। নাক-মুখ-চোখ চীনেম্যানের মত; নিশ্চয় লুকিয়ে লুকিয়ে আরশোলা খায়।'

'বিচিত্র নয়। তারপর বল, জ্বালিয়েছে কি ভাবে?'

'কদিন ধরে লোকটার পিছনে লেগে আছি, তা একবার কি এদিক-ওদিক যাবে! না, বাড়ি থেকে অফিস, আর অফিস থেকে বাড়ি। হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম স্যার। তারপর আজ—'

‘আজ কী হয়েছে?’

‘অন্যদিন পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরোয়, আজ সাড়ে চারতের সময় বেরুলো। বাড়ির দিকে গেল না, বৌবাজারের বাসে উঠল। আমিও উঠলাম। লোকটার মনে পাপ আছে বেশ বোঝা যায়, বারবার পিছু ফিরে চাইছে। আমি ঘাপটি মেরে আছি। শেষে শিয়ালদার কাছাকাছি এসে রবিবর্মা টুক করে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম।

‘আপনি লক্ষ্য করেছেন বোধহয় ঐখানে একটা হোটেল আছে—নাম ইন্দো-পাক হোটেল। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু একটু ঘুপ্‌সি গোছের। যারা পাকিস্তান থেকে যাওয়া-আসা করে, তারাই বেশির ভাগ এই হোটেলে ওঠে। নীচের তলায় রেস্তরাঁ, মুর্গী-মটম চলছে, ওপরতলায় থাকবার ঘর। রবিবর্মা হোটেলে ঢুকে পড়ল।

‘রেস্তরাঁয় হট্টগোল চলছে, রবিবর্মা সেদিকে গেল না। পাশের একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি ওপরে উঠে গেল।

‘আমিও গেলাম। সিঁড়ি যেখানে দোতলায় গিয়ে তেতলার দিকে মোড় ঘুরেছে, সেখানে সরু গলির মস্ত একটা বারান্দা, তার দু’পাশে সারি সারি ঘরের ঘর; মাথার ওপর ধোঁয়াটে একটা বাল্‌ব ঝুলছে। আমি সিঁড়ির মোড় থেকে উঁকি মেরে দেখলাম রবিবর্মা কোণের দিকের একটা ঘরের দরজা চাবি দিয়ে খুলছে। দরজা কিন্তু খুলল না; তখন রবিবর্মা চাবির গোছ থেকে আর একটা চাবি বেছে নিয়ে তালায় পরালো, কিন্তু তবু তালা খুলল না।

‘এই সময় তেতিলার দিক থেকে সিঁড়ির ওপর পায়ের আওয়াজ হল, দু-তিনজন ভাড়াটে নেমে আসছে। আমি তখন এমন ভাব দেখালাম যেন আমি দোতলায় থাকি, পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম; রবিবর্মা চট করে চাবির গোছা পকেটে-পুরে নীচে নেমে গেল; আমিও তার দরজাটা এক নজরে দেখে নিয়ে তাঁর পিছু নিলাম।

‘তারপর রবিবর্মা সটান বাড়ি ফিরে গেল। তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।‘

ব্যোমকেশের চক্ষু কিছুক্ষণ অন্তর্নিমগ্ন হইয়া রহিল।

‘ইন্দো-পাক হোটেল—হেনা পাকিস্তানের মেয়ে ছিল—রবিবর্মা—‘ বিকাশের দিকে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘ঘরের নম্বরটা লক্ষ্য করেছিলে?’

বিকাশ বলিল, ‘হ্যাঁ স্যার; দোরের মাথায় পেতলের নম্বর মারা ছিল—৭ নম্বর।‘

‘৭ নম্বর!’ ব্যোমকেশের চোখ ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

‘হ্যা স্যার, ৭ নম্বর।‘

ব্যোমকেশ আবার চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল; আমারও মনে হইল সাত নম্বর কথাটা কোথায় যেন শুনিয়াছি, হঠাৎ স্মরণ করিতে পারিলাম না। বিকাশ চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, '৭ নম্বরের কোন মাহাত্ম্য আছে নাকি স্যার?'

কোমকেশ চক্ষু খুলিল, বিকাশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'তুমিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের লোক! কিন্তু কাজ এখনো শেষ হয়নি। তুমি ইন্দো-পার্ক হোটেলে ফিরে যাও, ৭ নম্বর ঘরের সামনে পাহারা দাও। আমরা আধা ঘন্টার মধ্যেই যাচ্ছি।'

'আচ্ছা স্যার।' বিকাশ চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া ফোন তুলিয়া লইল। সংযোগ স্থাপিত হইলে বলিল, 'এ কে রে? আমি ব্যোমকেশ...একটু দরকার আছে..হেনার চাবির গোছা তোমার কাছে আছে তো?...বেশ বেশ। আমরা এখনি তোমার কাছে যাচ্ছি, চাবির গোছোটা দরকার...সাক্ষাতে বলব...তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আসতে পারো তো ভাল হয়...বেশ বেশ, আমরা এখনি যাচ্ছি।'

ফোন রাখিয়া দিয়া সে বলিল, 'চল, আজ রাত্রেই হেনা-রহস্যের সমাধান হবে মনে হচ্ছে।'

এতক্ষণে মনে পড়িল হেনার চাবির গোছায় একটা চাবিতে ৭ নম্বর ছাপ মারা ছিল।

এ কে রে-কে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া আমরা আন্দাজ আটটার সময় ইন্দো-পাক হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পথে একবার মাত্র কথা হইল, এ কে রে বলিলেন, 'আমি কিন্তু এখন পুলিস নই, স্রেফ তোমার বন্ধু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই সই।'

দোতলার সিঁড়ির মুখে বিকাশ রেলিংয়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া খাড়া হইল। ব্যোমকেশ চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাত নম্বর ঘরের খবর কি?'

বিকাশ বলিল, 'ভাল। আর কেউ আসেনি।'

'হোটেলের ম্যানেজার কোথায় থাকে জানো?'

'ঐ ঘরে!' বিকাশ সামনের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

ব্যোমকেশ এ কে রে-র দিকে দৃষ্টি ফিরাইল : চোখে চোখে কথা হইল। এ কে রে ঘাড় নাড়িয়া ম্যানেজারের ঘরের বন্ধ দ্বারে টোকা দিলেন।

দ্বার খুলিয়া একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিছনে আলোকিত ঘরটি দেখিতে পাইলাম, টেবিল-চেয়ার দিয়া সাজানো ঘর, ঘরে অন্য কেহ নাই, কেবল টেবিলের ওপর একটি বোতল শোভা পাইতেছে।

এ কে রে বলিলেন, 'আপনি হোটেলের ম্যানেজার?'

ম্যানেজার ঢুলু ঢুলু চক্ষে এ কে রে-র পোশাক অবলোকন করিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আসতে আজ্ঞা হোক।' বলিয়া তিনি আভুমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিতে গিয়া গোঁত্তা খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, এ কে রে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'আমি পুলিসের কাজে আসিনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

ম্যানেজারের কণ্ঠ হইতে বিগলিত হাসির খিকখিক আওয়াজ নির্গত হইল। এ কে রে ঘাড় ফিরাইয়া ব্যোমকেশকে চোখের ইশারা করিলেন, পকেট হইতে হেনার চাবির রিঙ লইয়া তাহার হাতে দিলেন, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। আমরা তিনজন বাহিরে রহিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এবার সাত নম্বর।'

সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে সাত নম্বর ঘর। টিমটিমে বালবের আলোয় চাবি বাছিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তালায় চাবি পরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তালা খুলিয়া গেল। চাবিটা যে এই ঘরেরই এবং হেনার এই ঘরে যাতায়াত ছিল তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

ঘর অন্ধকার। ঘরে পদার্পণ করিতে গিয়া মনে হইল একটা কালো হিংস্র জন্তু ঘরের কোণে ওৎ পাতিয়া আছে, আমরা পা বাড়াইলেই ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, দেশলাই বার করি।'

কিন্তু বিকাশ তৎপূর্বেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের পাশে হাতুড়াইয়া সুইচ টিপিল। দিপ করিয়া ঘরটা আলোকিত হইয়া উঠিল। আমরা ভিতরে গিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলাম।

ঘরের বদ্ধ বাতাসে সেঁতা-সেঁতা গন্ধ। একটি মাত্র জানালা বন্ধ। ঘরটি প্রায় নিরাভরণ; একদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি লোহার খাট নগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, অন্য দেওয়ালে একটি মধ্যমাকৃতি গোদরেজের স্টীলের আলমারি। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রথমেই স্টীলের আলমারির দিকে গিয়াছিল, সে চাবির রিঙ হইতে আর একটি চাবি লইয়া আলমারিতে লাগাইয়া পাক দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। বিকাশ ও আমি ব্যোমকেশের পিছন হইতে ঝুঁকিয়া দেখিলাম–

আলমারির তিনটি থাক। নীচের দু'টি থাক খালি, উপরের থাকে একটি বই এবং রেক্সিনে বাঁধানো পুস্তকাকার একটি ফাইল রহিয়াছে। পিছন দিকে একটি কৃষ্ণবর্ণ বস্তু অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া সেটি বাহিরে আনিল। দেখা গেল সেটি একটি ভাঙা মাউথ-অর্গান।

মাউথ-অর্গানটি নাড়িয়া-চাড়িয়া ব্যোমকেশ আবার রাখিয়া দিল। তারপর বইখানি তুলিয়া লইল। জগজগে বাঁধানো কোয়াটো সাইজের বাংলা বই, মলাটে ফারসী লিপির অনুকরণে নাম লেখা আছে—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইয়া দেখিল উপহার-পৃষ্ঠায় লেখা আছে—শ্রীমতী মীনা 'মাতাহারি' প্রিয়তমাসু। তিন্নিম্নে উপহর্তার নাম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। নামটা একান্ত পরিচিত।

বইখানি আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ রেক্সিন-বাঁধানো ফাইলটি হাতে লইল, সন্তর্পণে পাতা খুলিয়া আবার চট্ট করিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল। যতটুকু দেখিতে পাইলাম, মনে হইল কয়েকটি বাংলা হরফে লেখা চিঠি তাহার মধ্যে রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।' দেখিলাম, তাহার চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিতেছে। ঘরের বাহিরে আসিয়া সে দরজায় তালা লাগাইল, বলিল ,'এবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে।'

ম্যানেজারের ঘরে তখন আসর। জমিয়া উঠিয়াছে; নিঃশেষিত বোতলটি টেবিলের উপর গড়াইতেছে। এ কে রে একটি অর্ধ-পূর্ণ পাত্র হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, ম্যানেজার হাত-জোড় করিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন–'আর এক চুমুক স্যার, স্রেফ একটি চুমুক। আমার মাথার দিব্যি।'

আমরা প্রবেশ করিলে বোমকেশের সঙ্গে এ কে রে-র দৃষ্টি বিনিময় হইল, ব্যোমকেশ একটু ঘাড় নাড়িল। এ কে রে উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তাহলে–'

ম্যানেজার গদগদ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তা কি হয়! ভদ্র মহো-মহোদয়েরা এসেছেন, এক চুমুক না খেয়ে যেতে পাবেন না। আমি আর এক বোতল ভাঙছি।'

তিনি আলমারির দিকে অগ্রসর হইলেন, ব্যোমকেশ বাধা দিয়া বলিল, 'না না, আজ থাক, আর একদিন হবে। আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আপনার ৭ নম্বর ঘরে কে থাকে বলুন দেখি?'

'৭ নম্বর!' ম্যানেজার কিছুক্ষণ চক্ষু মিটমিটি করিয়া বলিলেন, 'ও ৭ নম্বর। একটি পাকিস্তানী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছেন। ভারি মজার লোক! মাসে মাসে ভাড়া গোনেন, কিন্তু মাসের মধ্যে বড় জোর তিন দিন আসেন। আধা ঘন্টা থেকেই চলে যান। ভারি মজার লোক।'

'তাঁর সঙ্গে কেউ আসে?'

ম্যানেজারের চোখে একটু ধূর্ততার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'একটি পরী আসে।'

'ভদ্রলোকের নাম কি?'

'নাম!' ম্যানেজার আকাশ-পাতাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'নামটা বিস্মরণ হয়ে গেছে। কিন্তু কুচ পরোয়া নেই, রেজিস্টারে নাম আছে।'

একটি বাঁধানো খাতা খুলিয়া তিনি বলিলেন, 'ঠিক ধরেছি, যাবে কোথায়? এই যে ভদ্রলোকের নাম-ঢাকা পাকিস্তান ওমর শিরাজি।' তিনি বিজয়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওমর শিরাজি। ধন্যবাদ–অশেষ ধন্যবাদ। আজ চলি, আবার একদিন আসব।'

ম্যানেজারের আর একটি বোতল ভাঙিবার সনির্বন্ধ প্রস্তাব এড়াইয়া আমরা নীচে নামিলাম। ব্যোমকেশ বিকাশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে। আজ বাড়ি যাও। শীগগির একদিন এস।'

বিকাশ প্রস্থান করিল। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরিয়া এ কে রে-র থানার দিকে চলিলাম, তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিব।

পথে যাইতে যাইতে এ কে রে বলিলেন, 'ম্যানেজার ভদ্রতার অবতার, একেবারে নাছোড়বান্দা ভদ্রলোক, আমাকে এক পেগ খাইয়ে তবে ছাড়লো। আরো খাওয়াবার তালে ছিল। —যাহোক, তোমার কাজ হল?'

ব্যোমকেশ চাবি তাহাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'হল। তুমি কিছু জানতে চাও না?'

এ কে রে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন, 'না।'

বাসায় ফিরিয়া ব্যোমকেশ প্রথমেই ওমর খৈয়ামের কাব্য ও চিঠির ফাইল সযত্নে দেরাজের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিল। আমি প্রশ্ন করিলাম, 'ওমর খৈয়ামকে তো চিনি, ওমর শিরাজি লোকটি কে?'

পুরনো খবরের কাগজটা টেবিলের ওপরেই ছিল, ব্যোমকেশ তাহার পাতা খুলিয়া আমাকে দেখাইল। পাকিস্তানী বিমান-দুর্ঘটনায় মৃতের তালিকায় নাম রহিয়াছে-ওমর শিরাজি, ন্যাভিগেটর।

রাত্রের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ চিঠির ফাইল লইয়া বসিল।

০৮. সন্তোষবাবু মারা গেছেন

পরদিন বেলা ন'টার সময় সন্তোষবাবুর অফিসে উপস্থিত হইলাম।

সন্তোষবাবু সবেমাত্র আসিয়া অফিসে বসিয়াছেন, ব্যোমকেশকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'একি! আপনি এখনো এখানে?'

ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার জন্যে ফাঁদ পাতব ভেবেছিলাম, তা আর দরকার হল না। হ্যাঁ , উড়িষ্যা সরকারের নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি, কিন্তু এখনো যাওয়া হয়নি। বসতে পারি?' অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে চেয়ারে বসিল। আমিও বসিলাম।

বেফাঁস কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্তোষবাবুর মুখ ক্ষণকালের জন্য লাল হইয়া উঠিল। তারপর তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'উড়িষ্যা সরকার!'

ব্যোমকেশের ঠোঁটে একটু হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, 'আপনার সুপারিশে উড়িষ্যা সরকার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন; আপনার উদ্দেশ্য তো তাঁরা জানেন না। কিন্তু ও-কথা যাক। সন্তোষবাবু, হেনা মল্লিককে কে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল আমি জানতে পেরেছি।'

আমি সন্তোষবাবুকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম তাঁহার মুখ পাঙাস হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুটা সর্পচক্ষুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। তিনি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক, কোণঠাসা বন-বিড়ালের মত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া যে অতিশয় বিপজ্জনক কাজ, তাহা নিমেষ মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন, 'কে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

ব্যোমকেশ সহজ সুরে বলিল, 'আপনি।'

যেন কেহ তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে এমনি স্বরে সন্তোষবাবু বলিলেন, 'প্রমাণ করতে পারেন?'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে মাথা নাড়িল, 'না। তবে আপনার মোটিভ আছে তা প্রমাণ করা যায়।'

'তাই নাকি। আমি আপনার নামে মানহানির মোকদ্দমা করে আপনাকে জেলে পাঠাতে পারি তা জানেন?'

'আমার নামে মোকদ্দমা করবার সাহস আপনার নেই, সন্তোষবাবু! আমার কাছে আস্ফালন করেও লাভ নেই। শুনুন, আপনি আমাকে আপনার পরিবারিক স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, সে কাজ আমি করেছি। যে কারণেই হোক, পুলিস হেনার

মৃত্যুর তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে, আমার ও-বিষয়ে কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু সত্য কথা জানিবার অধিকার সকলেরই আছে। আমি সত্য কথা জানতে পেরেছি।'

সন্তোষবাবু কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের মধ্যে কত প্রকার চিন্তা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল তাহা নির্ণয় করা যায় না। শেষে তিনি বলিলেন, 'কি সত্য কথা জানতে পেরেছেন আপনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যা খুঁজেছিলেন, কিন্তু আপনি পাননি, যার জন্যে আপনি ঘরে আগুন দিয়েছিলেন, আমি তাই পেয়েছি! একখানা বই-রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, আর কয়েকটা চিঠি।'

সন্তোষবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঠিল। তিনি অসহায় বিষাক্ত চোখে চাহিয়া বলিলেন, 'কি চান আপনি? টাকা?'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল, 'আমাকে ঘুষ দিতে পারেন এত টাকা আপনারও নেই, সন্তোষবাবু। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, দেশদ্রোহিতা করেছেন, তার শাস্তি পেতে হবে।'

সন্তোষবাবু নির্বাক চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার রাগের শিরা দপদপ করিতে লাগিল।

'হেনার মা মীনার সঙ্গে আপনার প্রণয় ছিল। দেশ ভাগাভাগির সময় আপনি ঢাকায় যেতেন, মীনার সঙ্গে দেখা করতেন। আপনি জানতেন মীনা বিপক্ষ দলের গুপ্তচর, তা জেনেও আপনি নিজের দলের গুপ্তকথা তাকে বলতেন। শুধু মুখে বলেই নিশ্চিন্ত হননি, চিঠি লিখে নিজের দলের সমস্ত সলা-পরামর্শ তাকে জানাতেন। তার ফলে পদে পদে আমাদের হার হয়েছে, আমাদের প্রাপ্য ভূখণ্ড আমরা হারিয়েছি।

'আপনার চিঠিগুলো মীনা রেখে দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ সে মরে গেল, চিঠিগুলো তার মেয়ে হেনার হাতে এল। হেনার একজন দোসর ছিল-ওমর শিরাজি। দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করল, তারপর হেনা এসে আপনার বুকে চেপে বসে ব্ল্যাকমেল শুরু করল।'

সন্তোষবাবুর চোখ দুটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এক লাখ টাকা দেব, চিঠিগুলো আমায় ফেরৎ দিন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষবাবু দাঁড়াইলেন, রক্তাক্ত ভীষণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'দেবেন না?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'কাল থেকে একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে আপনার চিঠিগুলির ফ্যাকসিমিলি একে একে ছাপা হবে। প্রস্তুত থাকবেন।'

সন্তোষবাবু দুই চক্ষে অগ্নি বিকীর্ণ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ আমাকে ইশারা করিল, আমরা দ্বারের দিকে চলিলাম।

পিছন হইতে ডাক আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

আমরা ফিরিয়া গিয়া সন্তোষবাবুর সামনে দাঁড়াইলাম, তিনি টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। এক মিনিট পরে তিনি হাত নামাইলেন; দেখিলাম তাঁহার মুখ ভাবলেশহীন। তিনি বলিলেন, 'আমাকে একদিন সময় দেবেন? আজ বিকেল পাঁচটার সময় পার্ক সার্কাস মাঠে আমার বক্তৃতা আছে—'

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরস্বরে বলিল, 'একদিন সময় দিলাম। কাল, সকালে সংবাদপত্রে আপনার চিঠি ছাপা হবে না। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি। গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে খুন করালেও কোনো লাভ হবে না, চিঠিগুলির নাগাল আপনি পাবেন না। যথাসময়ে সেগুলি ছাপা হবে।'

'ধন্যবাদ।'

সারাদিন ব্যোমকেশ তক্তপোশে শুইয়া কড়িকাঠ গণনা করিল, কথা বলিল না। বেলা চারটের সময় চা আসিলে উঠিয়া বসিয়া চা পান করিল, তারপর বলিল, 'চল, বেরনো যাক।।'

'কোথায় যাবে?

'সন্তোষবাবুর লেকচার শুনতে।'

সুতরাং বাহির হইলাম। মাথার উপর যাহার খাঁড়া ঝুলিতেছে, সে কিরূপ বক্তৃতা দিবে। শুনিবার কৌতূহল বোধকরি স্বাভাবিক।

পার্ক সার্কাসের মাঠে মঞ্চ রচিত হইয়াছে, মঞ্চের উপর এক সারি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপবিষ্ট, প্রধান সচিবও আছেন। সম্মুখে বৃহৎ জনতা। রাজনৈতিক কোনো একটা গুরুতর প্রসঙ্গ জনসাধারণের গোচর করার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। আমরা জনতার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী উঠিলেন, তিনিই সভাপতি। মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিষয়বস্তুর অবতারণা করিলেন। তারপর একে একে বক্তারা উঠিলেন। সামান্য যুক্তিতর্কের ফোড়ন দিয়া প্রবল হৃদয়বেগপূর্ণ বক্তৃতা। মুগ্ধ হইয়া বাক্যতরঙ্গে ভাসিয়া চলিলাম।

সর্বশেষে মাইকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন সন্তোষবাবু। তাঁহার মুখের দৃঢ় গাম্ভীর্য বিষয়বস্তুর গুরুত্র সূচনা করিতেছে। ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকটির বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা আছে। উচ্ছ্বাস নাই, ভাবালুতা নাই, কেবল দুনিবার যুক্তির দ্বারা তিনি শ্রোতার সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার

ভাষণের ছন্দ দ্রুত হইতে লাগিল, অন্তর্গূঢ় আবেগে কণ্ঠস্বর মৃদঙ্গর ন্যায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি যখন বক্তৃতার শেষে উদাত্ত কণ্ঠে বন্দে মাতরম উচ্চারণ করিলেন, তখন শ্রোতাদের কণ্ঠ হইতেও স্বতরুৎসারিত জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

ভাষণ শেষ করিয়া সন্তোষবাবু নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।' আমার দৃষ্টি তাঁহার উপরেই নিবদ্ধ ছিল, দেখিলাম। তিনি পকেট হইতে একটি কোটা বাহির করিয়া কিছু মুখে দিলেন। ভাবিলাম, হয়তো পেনিসিলিনের বড়ি।

ইতিমধ্যে প্রধান সচিব আসিয়া সভা সংবরণের ভাষণ আরম্ভ করিয়াছেন, শ্রোতারা উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মঞ্চের উপর একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। মুহূর্তে আমার দৃষ্টি সেইদিকে ছুটিয়া গেল; দেখিলাম সন্তোষবাবু নিজ আসনে এলাইয়া পড়িয়াছেন, আশেপাশে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার দিকে ঝুকিয়া দেখিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ থামাইয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটা উত্তেজিত গুঞ্জন উঠিল।

পাঁচ মিনিট পরে প্রধানমন্ত্রী মাইকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ, দেশের সুসন্তান সন্তোষ সমাদ্দার ইহলোক ত্যাগ করেছেন—?

তিনি ভগ্নস্বরে বলিয়া চলিলেন। ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল, বলিল, 'চল। পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা পতন হয়েছে।'

পার্কের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, বলিল, 'চল, হাঁটা যাক।'

পথ অনেকখানি, তবু ট্রামে-বাসে চড়িবার ইচ্ছা হইল না। আমিও সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'চল।'

পাশাপাশি চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল–

'সন্তোষবাবু প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি চরিত্রবান ছিলেন না। ইংরেজিতে কথা আছে-নাবিকদের বন্দরে বন্দরে বৌ, সন্তোষবাবুরও ছিল তাই। তিনি কাজের সূত্রে মাদ্রাজ বোম্বাই দিল্লী সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, আমার বিশ্বাস প্রত্যেক শহরেই তাঁর একটি করে প্রেয়সী ছিল। বুড়ো বয়সেও তাঁর ও-রোগ সারেনি।

'কলকাতাতে যেমন তাঁর ছিল সুকুমারী, ঢাকায় তেমনি ছিল মীনা। মীনা ধর্মে মুসলমানী ছিল। সকল দেশে সকল সভ্য সমাজেই এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক থাকে যারা বাইরে বেশ সভ্য-ভাব্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিলাসিনীর ব্যবসা চালায়। পাশ্চাত্য দেশে ওদের নাম-ডেমি মনডোন। মীনা ছিল ডেমি মনডোন। তার স্বামী ছিল কিনা জানি না, বোধহয় সাক্ষীগোপাল গোছের একজন কেউ ছিল, তার নাম কমল মল্লিক। কমল মল্লিক নামটা হিন্দু নাম, আবার কামাল মল্লিক বললে মুসলমান নাম হয়ে যায়। হেনা মল্লিক নামটাও তাই। মল্লিক পদবী হিন্দুদের মধ্যে আছে, কিন্তু আসলে ওটা মুসলমানী খেতাব।

‘মীনার ছবি দেখেছ, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। সমাজের উঁচু মহলে তার প্রসার ছিল। সন্তোষবাবুকেও সে কুহকের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছিল, যখনই তিনি ঢাকায় যেতেন। মীনার সঙ্গে তাঁর দেখা হত। সে বোধহয় তাঁকে গজল শোনাতো।

‘তারপর এল স্বাধীনতা, এল দেশ-ভাগাভাগির যুদ্ধ। সে যে কী নৃশংস যুদ্ধ তা কারুর ভোলবার কথা নয়। এই সময় সন্তোষবাবু আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। দুই পক্ষের মধ্যে যখন দূতের প্রয়োজন হল, তখন সন্তোষবাবু আমাদের পক্ষ থেকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হলেন। তিনি বারবার কলকাতা থেকে ঢাকা যাতায়াত করতে লাগলেন। স্বভাবতাই মীনার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগিল।

সন্তোষবাবু তখন মীনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তিনি নিজের দলের অতিবড় গুপ্তকথাগুলিও মীনার কাছে প্রকাশ করে ফেলতে লাগলেন। মীনা রঙ্গিণী মেয়ে হলেও নিজের দলের স্বার্থচিন্তা তার মনে ছিল, সে গুপ্ত সংবাদগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে লাগল। অবস্থাটা ভেবে দেখ, রাজনৈতিক কূটযুদ্ধ চলছে, ওদের গুপ্ত অভিপ্রায় আমরা কিছুই জানি না, ওরা আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায় সমস্ত জানে। ফল অনিবার্য।

‘সন্তোষবাবুর তখন এমন মোহমত্ত অবস্থা যে, তিনি মীনাকে কেবল মৌখিক গুপ্তকথা জানিয়ে নিরস্ত হননি, যখন কলকাতায় থাকতেন তখন চিঠি লিখে তাকে গুপ্ত সংবাদ জানাতেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী আমি জানি না, সম্ভবত অন্য কোন দেশনেতার প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা। কিন্তু তিনি যে জেনেশুনে মীনাকে খবর পাঠাতেন,

তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম বইয়ের উপহার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন—মীনা মাতাহারি। তিনি জানতেন মীনা বিপক্ষ দলের গুপ্তচর।

যাহোক, দেশ-ভাগাভাগির লড়াই একদিন শেষ হল। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। মীনা সন্তোষবাবুর চিঠিগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, নষ্ট করেনি। তার কি মতলব ছিল বলতে পারি না, হয়তো ভেবেছিল কোনদিন সন্তোষবাবু যদি বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করেন তখন চিঠিগুলো কাজে লাগবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন মীনা মারা গেল। বোধহয় অ্যাকসিডেন্টেই মারা গিয়েছিল।

'মীনার একটি মেয়ে ছিল–হেনা। মা যখন মারা গেল তখন সে সাবালিকা হয়েছে। সে মায়ের কাগজপত্রের মধ্যে সন্তোষবাবুর চিঠিগুলো খুঁজে পেল। হেনার নিশ্চয় দু-চারজন উমেদার ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম ওমর শিরাজি। শিরাজি বিমান কোম্পানিতে কাজ করত, এরোপ্লেনের ন্যাভিগেটর। দেশে দেশে উড়ে বেড়াতো, তার প্লেনের দৌড় সিঙ্গাপুর থেকে কায়রো। দশ-বারো দিন অন্তর তার প্লেন দমদমে নামতো।

'হেনা ওমর শিরাজিকে চিঠির কথা বলল, দু'জনে পরামর্শ করল সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করবে। তারা কলকাতায় এসে সোজাসুজি তাদের মতলব সন্তোষবাবুকে জানালো। হেনা এসে তাঁর বাড়িতে জাঁকিয়ে বসল। ওরা ভেবে দেখেছিল সন্তোষবাবুর বাড়িই হেনার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। সন্তোষবাবু জাঁতিকালে পড়ে গেলেন। ইচ্ছে থাকলেও হেনাকে খুন করতে পারেন না, তাহলেই ওমর শিরাজি তাঁর গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবে। তিনি ব্ল্যাকমেলের টাকা শুনতে লাগলেন।

মারাত্মক চিঠিগুলো হেনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সন্তোষবাবু আবিষ্কার করতে পারেননি, তবে সন্দেহ করেছিলেন যে হেনা তাঁর বাড়িতে নিজের ঘরে চিঠিগুলো লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু নিজের বাড়ি বলেই সেখানে তল্লাশ করবার সুবিধা নেই। হেন সর্বদা নিজের ঘরে থাকে, কেবল সন্ধ্যেবেলা নমাজ পড়বার জন্যে একবার ছাদে যায়। তাও দোরে তালা লাগিয়ে।

'ওমর শিরাজি ইন্দো-পাক হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেই ঘরে ওদের সাক্ষী প্রমাণ যাবতীয় চিঠিপত্র ওরা লুকিয়ে রেখেছিল। বোধহয় ব্যবস্থা ছিল, সন্তোষবাবু হেনাকে হগুয় হগুপ্তায় টাকা দেবেন। কত টাকা দিতেন জানি না, সন্তোষবাবুর ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষা করলে জানা যাবে। যাহোক, টাকা নিয়ে হেনা ওমর শিরাজির অপেক্ষা করত। যথাসময়ে শিরাজি এসে মাউথ-অর্গান বাজিয়ে তাকে সঙ্কেত জানাতো, তারপর দু'জনে ইন্দো-পাক হোটেলে যেত। সেখানে হেনা শিরাজিকে টাকা দিত, শিরাজি টাকা নিয়ে পাকিস্তানে চলে যেত। এই ছিল তাদের মোটামুটি কর্মপদ্ধতি।'

বলিলাম, 'ভারতীয় টাকা নিয়ে যেত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকা নিয়ে যেত, কিংবা সোনা কিনে নিয়ে যেত, কিংবা কলকাতার কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে যেত। আমার বিশ্বাস টাকা নিয়ে যেত।'

'তারপর বলো।'

‘হেনা যে সন্তোষবাবুর অনাথ বন্ধু-কন্যা নয়, সে তাঁর রক্ত-শোষণ করছে, একথা কেবল একজনই সন্দেহ করেছিল। রবিবর্মা। সে সন্তোষবাবুর সেক্রেটারি, তার ওপর ভীষণ ধূর্ত ধড়িবাজ লোক। হেনাকে সে আগে থাকতে চিনত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কোন সময় সে হেনার পিছু নিয়ে ইন্দো-পাক হোটেলের সন্ধান পেয়েছিল, বুঝেছিল যে ৭ নম্বর ঘরে মারাত্মক দলিল আছে। সে এক গোছা চাবি যোগাড় করে তাক বুঝে ৭ নম্বর ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দরজা খুলতে পারেনি। তার বোধহয় মতলব ছিল দলিলগুলো হস্তগত করতে পারলে সে-ই সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। হেনার মৃত্যুর পর সে একবার চেষ্টা করেছিল। বিকাশ তার পিছনে লেগেছিল, সে দেখে ফেলল। বিকাশ যদি তাকে ইন্দো-পাক হোটেলের ৭ নম্বর ঘরের সামনে দেখতে না পেত, তাহলে সন্তোষবাবুকে ধরা যেত না।’

আমি বলিলাম, ‘একটা কথা। এমন কি হতে পারে না যে, সন্তোষবাবুই রবিবর্মাকে নিযুক্ত করেছিলেন দলিলগুলো উদ্ধার করার জন্যে?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘না। সন্তোষবাবু এর মধ্যে থাকলে ছিঁচকে চোরের মত কাজ করতেন না। ম্যানেজারকে মোটা ঘুষ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতেন। যাহোক, পরের কথা আগে বলব না। সন্তোষবাবু জাঁতিকালে পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করছেন, ছ-মাস কেটে গেছে, আরো কতদিন চলবে ঠিক নেই, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল। একদিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে সন্তোষবাবু দেখলেন একটি পাকিস্তানী বিমান সমুদ্রে ডুবেছে, মৃতদের মধ্যে নাম পেলেন-ওমর শিরাজি।

‘ব্যাস, সন্তোষবাবু উদ্ধারের পথ দেখতে পেলেন। হেনা খবরের কাগজ পড়ে না, সে এখনো জানতে পারেনি; সে খবর পাবার আগেই তাকে শেষ করতে হবে। তিনি জানতেন, হেনা রোজ সন্ধ্যেবেলা নমাজ পড়তে ছাদে যায়। বর্তমানে বাড়ি মেরামত হচ্ছে , ভারা বেয়ে বাইরে থেকে ছাদে ওঠা সহজ। তিনি ঠিক করে ফেললেন কী করে হেনাকে মারবেন। এমনভাবে মারবেন যাতে অপঘাত মৃত্যু বলে মনে হয়।

‘দিনটা ছিল শনিবার। বিকেলবেলা তিনি সুকুমারীর কাছে গেলেন, সুকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের অ্যালিবাই তৈরি করলেন। আট-ঘাট বেঁধে কাজ করতে হবে।’

আমি বলিলাম, ‘সুকুমারী যে আমাদের কাছে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল তা বুঝতে পারিনি।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘হ্যাঁ। সন্তোষবাবুর প্রতি সুকুমারীর প্রাণের টান ছিল, নইলে সে তাঁর জন্যে নিজেকে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলত না। সন্তোষবাবুর মৃত্যুতে যদি কেউ দুঃখ পায় তো সে সুকুমারী।

‘খিড়কির ফটক দিয়ে সন্তোষবাবু নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, ভারা বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। হেনা বোধ হয় তখন মাদুর পেতে পশ্চিমদিকে মুখ করে নামাজ পড়বার উপক্রম করছিল, দেখল সন্তোষবাবু উঠে আসছেন। তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে হেনার দেরি হল না, সে ভয় পেয়ে ছাদের পুবদিকে পালাতে লাগল। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়?

আলসের কাছে আসতেই সন্তোষবাবু পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিলেন, সে ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেল।

'সন্তোষবাবু ছাদের শিকল খুলে দিয়ে, যেমন এসেছিলেন তেমনি ভারা বেয়ে নেমে গেলেন। শিকল খুলে দেবার কারণ—যদিও কেউ হেনার মৃত্যুকে খুন বলে সন্দেহ করে, তাহলেও আততায়ী কোন দিক থেকে ছাদে উঠেছে তা অনিশ্চিত থেকে যাবে।

'সন্তোষবাবু বাড়িতে এসেছিলেন তা কেউ জানল না, তিনি কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করে সুকুমারীর কাছে ফিরে গেলেন। কিন্তু একটা কাজ বাকি ছিল।

'চিঠিগুলো নিশ্চয় হেনার ঘরে আছে। পুলিস খুঁজে পায়নি বটে, কিন্তু পরে পেতে পারে। গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তিনি চুপি চুপি নেমে এসে হেনার ঘর তল্লাশ করলেন। কিন্তু চিঠি খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি পেট্রোল ঢেলে হেনার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সন্তোষবাবুকে টেলিফোন করেছিল কে?'

সে বলিল, 'কেউ না। ওটা কপোলকল্পিত। নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ফিরে গিয়ে সন্তোষবাবু নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, হেনা যদি দৈবাৎ না মরে থাকে! তাছাড়া চিঠিগুলো হেনার ঘর

থেকে সরাতে হবে। তাই তিনি একটি অজ্ঞাত সংবাদদাতা সৃষ্টি করলেন; সুকুমারীকে টেলিফোন সম্বন্ধে তালিম দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।'

'অদ্ভূত অভিনেতা কিন্তু সন্তোষবাবু।'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত বক্তা, অদ্ভুত অভিনেতা-এরা সব এক জাতের।'

'আচ্ছা ব্যোমকেশ, সন্তোষবাবু তোমাকে পারিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করলেন কেন? গোড়াতেই তোমাকে বিদেয় করলেন না কেন?'

'নেংটি একটা দুষ্কার্য করে ফেলেছিল, আমাকে ডেকেছিল। আমাকে বিদেয় করে দিলে তাঁর ওপর সকলের সন্দেহ হত, তাই তিনি সাধু সেজে আমাকে তাঁর পরিবারিক স্বার্থরক্ষার জন্যে নিযুক্ত করলেন। পরে অবশ্য ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন কমলি নেহি ছোড়তি।'

'তুমি কখন ওঁকে সন্দেহ করলে?'

'ঘরে আগুন লাগার খবর পেয়ে বুঝলাম কোনো দাহ্য পদার্থ পুড়িয়ে দেবার জন্যেই ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। কি রকম দাহ্য পদার্থ? নিশ্চয় এমন কোনো দাহ্য পদার্থ, যা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবতাই দলিলের কথা মনে আসে। কি রকম দলিল? যার সাহায্যে ব্ল্যাকমেল করা যায়। তাহলে হেনা কাউকে ব্ল্যাকমেলা করছিল? কাকে

ব্ল্যাকমেল করছিল? যুগল আর উদয়কে বাদ দেওয়া যায়; বাকি রইল রবিবর্মা এবং সন্তোষবাবু। কিন্তু রবিবর্মা সামান্য লোক, তাকে ব্ল্যাকমেল করে বেশি টাকা আদায় করা যায় না। অপর পক্ষে সন্তোষবাবু বড়লোক, তাঁর পূর্ববঙ্গে নিত্য যাতায়াত, হেনাকে তিনি নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। পুলিসের শৈথিল্যের পিছনেও হয়তো তাঁর প্রভাব কাজ করছে। আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে কটকে পাঠানোর চেষ্টার পিছনেও তিনি আছেন। সুতরাং তিনিই সব দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র।–ভাল কথা কাল সকালে কটকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে, জানা দরকার তারা এখনো আমাকে চায় কিনা।'

'বেশ। সন্তোষবাবুর চিঠিগুলো কি করবে?'

'পুড়িয়ে ফেলব। ও চিঠির কাজ শেষ হয়েছে। সন্তোষবাবু প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তাঁর সুনাম নষ্ট করে কারুর লাভ নেই। মগ্নমৈনাক মগ্নই থাক।'

বাসায় ফিরিয়া দেখি নেংটি বসিয়া আছে। সত্যবতীর নিকট হইতে চা ও সিগারেট সংগ্রহ করিয়া পরম আরামে সেবন করিতেছে। সে সন্তোষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পায় নাই। ব্যোমকেশকে দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া ব্যগ্রভরে বলিল, 'কী, এখনো হেনার খুনীকে ধরতে পারলেন না।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল, 'পেরেছি। তুমি এখানে কি করছ?'

নেংটি সচকিত অবিশ্বাসের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'পেরেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। তুমি পেরেছ নাকি।'

নেংটি আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আমি–আমি তো গোড়া থেকেই জানি।'

'গোড়া থেকেই জানো! কি করে জানলে? বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছ? আততায়ীর নাম বল তো শুনি?'

নেংটি স্খলিত স্বরে বলিল, 'মেসোমশাই।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তুমি জানো! কি করে জানলে?'

নেংটি দ্রুত বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, 'আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, ব্যোমকেশদা। আমি বাড়ির পিছন দিকের পাইনগাছে উঠে সিগারেট খাচ্ছিলাম। এমন সময় হেনা ছাদে এল, মাদুরটা পেতে বসতে যাবে, হঠাৎ মেসোমশাই পশ্চিমদিকের ভারা বেয়ে উঠে এলেন। তাঁকে দেখেই হেনা দৌড়ে পুবদিকে গেল, তিনিও তার পিছনে ছুটলেন, তাকে ঠেলা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন।'

ব্যোমকেশ কঠোর চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'তুমি এতদিন একথা বলনি কেন?'

নেংটি কাতর স্বরে বলিল, 'কি করে বলি, ব্যোমকেশদা। উনি আমাদের অন্নদাতা, ওঁকে পুলিসে ধরিয়ে দেব কি বলে? তবু আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, জানতাম, কেউ যদি অপরাধীকে ধরতে পারে তো সে আপনি।'

ব্যোমকেশের মুখ নরম হইল, সে নেংটির-কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'নেংটি, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। সন্তোষবাবু মারা গেছেন।'